শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা-১২

এই পুস্তকের একত্রিশটি গল্পে আকারগত হ্রস্বতা ছাড়া আর কোনও ঐক্য নাই; কেবলমাত্র দৈহিক ক্ষুদ্রতার অপরাধে ইহারা এক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এক দল বেঁটে মানুষকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে যদি একই পংক্তিকে বসিয়া আহার করিতে বাধ্য করা হয়, ইহাদের দশাও তাই।

উপরন্তু গল্পগুলিকে গুণানুক্রমিক কোনও প্রাধান্য না দিয়া কেবল নামের বর্ণনানুক্রমে সাজানো হইয়াছে। ইহাতে পাঠকের সুবিধা হইবে কিনা জানি না, কিন্তু প্রকাশকের সুবিধা এই যে কাগজের দুর্মূল্যতার দিনে সূচী ছাপিতে হইবে না।

কয়েকটি গল্পে 'আমি' নামক কিম্ভূত ব্যক্তি গল্পের বক্তা। এই 'আমি'-কে গ্রন্থকার মনে করিলে ভ্রম হইবে। বস্তুতঃ, এই 'আমি' এক ব্যক্তি নয়,—গল্পভেদে তাহাদের বয়স, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরিচিতা

একটি শ্যামাঙ্গী যুবতী মেঝেয় মাদুর পাতিয়া ঘুমাইতেছে। এলো চুলগুলি বালিশের উপর বিস্রস্ত; অধর পানের রসে রাঙা হইয়া আছে; গায়ের কাপড় কিছু শিথিল। হঠাৎ দেখিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিলাম না।

লুচ্চা মনে করিয়া আমাকে ঘৃণা করিবেন না; এমন মাঝে মাঝে সকলেই হয়। আমি বিবাহিত লোক, দশ বৎসর ধরিয়া দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আজ হঠাৎ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে এই নিদ্রালসা যুবতীকে দেখিয়া আমার যে এমন আত্মবিস্মৃতি ঘটিবে তাহা আমি নিজেই কোনও দিন ভাবিতে পারি নাই।

ঘরে ঢুকিয়া মাদুরের উপর চোখ পড়িতেই চমকিয়া উঠিয়াছিলাম; কিছুক্ষণ দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। যুবতীর শিয়রে খোলা জানালা দিয়া অপর্যাপ্ত আলো প্রবেশ কবিয়াছিল; লোভী আলো যেন লুব্ধতা সংবরণ করিতে না পারিয়া বিস্রস্তবসনার অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। দাম্পত্য সৌভাগ্যের কৃপায় আমার মনে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে স্ত্রীজাতির দেহ-মন সম্বন্ধে সব কিছু অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার অবসান হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ যেন অভিনব দৃষ্টি লাভ করিলাম; সচরাচর যে আটপৌরে দৃষ্টি দিয়া জগৎব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া থাকি তাহা পরকোলার মতো খসিয়া গেল।

পা টিপিয়া টিপিয়া নিদ্রিতার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার চক্ষের দীর্ঘ পল্লবগুলি অল্প অল্প স্পন্দিত হইতেছে; পানের রসে রাঙা ঠোঁট একটু নড়িতেছে; গাল দুটিতে ঈষৎ রক্তিমাভা। দেখিলাম, বাহিরে নিদ্রিতা হইলেও অন্তর্লোকে সে কোন চটুল সকৌতুক খেলায় মাতিয়াছে।

রাঙা ঠোঁট ঈষৎ বিভক্ত হইয়া গেল; শুনিলাম অর্ধস্ফুট-কণ্ঠে সে বলিতেছে—

'·রাজার দুলাল······যাবে আজি মোর···'

কী সর্বনাশ! কবিতা!! রাজার দুলাল!! এ যে অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই!

নিদ্রিতার মুখের উপর দিয়া আরও কত বিচিত্র ভাব ক্রীড়া করিয়া গেল। আমি নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দেখিলাম; বুক গুরু গুরু করিতে লাগিল।

আবার সে অস্ফুট স্বরে বলিল, 'না না রাজকুমার, এখন নয়···নিশীথে আইও ফুলবনে······'

নাভি হইতে তালু পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। সত্যই তো, এ নারী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা; চোখে যেমন নূতন দেখার স্বাদ পাইতেছি, মনেও তাই। কি আশ্চর্য! দশ বৎসর বিবাহ করিয়াছি, এক সঙ্গে উঠিতেছি বসিতেছি, একদিনের জন্য কখনও ছাড়াছাড়ি হই নাই—অথচ—

হঠাৎ দারুণ ভয় হইল। তবে কি এ সে নয়? এতদিন ধরিয়া যাহাকে চিনিবার ভান করিয়াছি সত্যই তাহাকে চিনি না?

নিদ্রিতার গায়ে প্রবল একটা নাড়া দিয়া বলিলাম, 'ওগো, তিনটে বেজে গেল—ওঠ ওঠ!'

গৃহিণী নিদ্রা ভাঙিয়া সটান উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, 'এসেছ? পাওনাদার মিন্‌সে এসেছিল—বলে গেছে—'

এই তো আমার চির-পরিচিতা! প্রকাণ্ড হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বলিলাম, 'চুলোয় যাক্ পাওনাদার। এখন চট্ করে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দাও তো দেখি। গলাটা ভারি শুকিয়ে গেছে।

✓অযাত্রা

রামবাবু আপিস যাইবার জন্য বাড়ি হইতে বহির্গত হইতেছেন। বেলা আন্দাজ ন'টা।

'দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা—'

দ্রুত মৃদু কণ্ঠে দুর্গানাম আবৃত্তি করিতে করিতে রামবাবু চৌকাঠ পার হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাদরের খুঁটে টান পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন দরজার হুড়কায় চাদর আটকাইয়া গিয়াছে।

বিমর্ষভাবে রামবাবু ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিলেন। গৃহিণী বলিলেন, 'বাধা পড়ল তো ?'

'হুঁ'—মন খারাপ করিয়া রামবাবু দেয়ালে লম্বিত মা-কালীর পটের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রত্যহই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তাঁহার আপিস যাওয়া একটা পর্ব বলিলেই হয়। ঠিক যে সময়টিতে তিনি চৌকাঠ পার হইবেন সে সময়ে বাড়ির ভিতর কাহারও কথা কহিবার হুকুম নাই—কথা কহিলেই উহা পিছু ডাকা হইয়া পড়িবে। কলিকাতা শহর যখন শত উপায়ে অসহায় রামবাবুর প্রাণবধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে এবং আপিসের বড় সাহেব যখন প্রতি সপ্তাহে কেরানি কমাইতেছে—এরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে 'পিছু-ডাক' শুনিয়াও যে নাস্তিক ঘরের বাহির হইতে পারে তাহার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—এ কথা কে অস্বীকার করিবে ?

রামবাবু কালীমূর্তির উপর হইতে চক্ষু সরাইয়া ঘড়ির উপর স্থাপন করিলেন। সওয়া ন'টা। আপিসে পৌঁছিতে মোটামুটি পঁচিশ মিনিট

সময় লাগে, সুতরাং চৌকাঠ যদি নির্বিঘ্নে পার হওয়া যায় তাহা হইলে দশটার মধ্যে আপিস পৌঁছিবার কোনই বাধা নাই।

'কালী কালী কালী কালী কালী—'

বিঘ্নকারী কোনও উপদেবতাকে ফাঁকি দিবার জন্যই যেন রামবাবু সুড়ুৎ করিয়া দ্বার লঙ্ঘন করিয়া গেলেন। কিন্তু ফুটপাথে নামিয়াই তাঁহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। একটি গেঞ্জি-পরা লোক -- বোধ হয় কোনও মেসের ম্যানেজার -- তরি-তরকারি কিনিয়া হন্ হন্ করিয়া যাইতেছিল, তাহার সহিত রামবাবুর চোখাচোখি হইয়া গেল।

ক্ষণকাল তিনি স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকটি ততক্ষণ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, তিনি চমকিয়া ডাকিলেন, 'ওহে শোনো।'

লোকটি ক্রুদ্ধভাবে ফিরিল, দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, 'কী চাই?'

রামবাবু তাহার দিকে এক-পা অগ্রসর হইয়া গেলেন; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার গণ্ডের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি দাড়ি কামিয়েছ - না মাকুন্দ?'

'তোর তাতে কিরে শালা?'—অগ্নিশর্মা ম্যানেজার আর একবার দাঁত খিঁচাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

খনার বচন অগ্রাহ্য করিবার যো নাই। খনা বলিয়াছেন—

'যদি দেখ মাকুন্দ চোপা
এক পা'ও যেওনা বাপা।'

ঐ গেঞ্জি-পরা লোকটার মসৃণ গণ্ডস্থল দেখিয়া রামবাবুর সন্দেহ হইয়াছিল যে সে মাকুন্দ। তা—মাকুন্দ হোক্ বা না হোক্, ইহার পর যাত্রা না বদলাইয়া আপিস যাওয়া চলে না। রামবাবু ফিরিলেন। গৃহিণী মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিলেন, 'আবার বাধা পড়ল?'

রামবাবু উত্তর দিলেন না, ভৎর্সনাপূর্ণ নেত্রে একবার মা কালীর পটের দিকে তাকাইলেন। মা কালী পূর্ববৎ জিভ বাহির করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কন্যা পুঁটুকে রামবাবু বলিলেন, 'এক গেলাস জল দাও তো, মা।'

জল পানে যাত্রা বদল হয়। গেলাস নিঃশেষ করিয়া রামবাবু আবার দেয়ালের দিকে তাকাইলেন। মা কালীর পাশে একটি মহাদেবের ছবি টাঙানো ছিল, তদ্গত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইদানীং বাধাবিঘ্নের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে প্রথম বার যাত্রা করিয়া আপিসে পৌছানো রামবাবুর আর ঘটিয়া উঠে না। তিনি তাই বেলা নয়টা হইতে পায়তাড়া ভাঁজিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তবু দেরি হইয়া যায়। ইতিপূর্বে কয়েকবার সাহেবের ধমক খাইয়াছেন। কিন্তু দৈব যেখানে পদে পদে বাধা দিতেছে সেখানে বিলম্ব না হইয়া উপায় কি?

সাহেবের কথা মনে পড়িতেই রামবাবুর সমাধি ভাঙিয়া গেল; তিনি আড় চক্ষে ঘড়ির পানে চাহিলেন। সাড়ে ন'টা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। কোনও মতে নির্বিঘ্নে দ্বার অতিক্রম কবিতে পারিলে এখনও যথা সময়ে আপিস পৌছানো যাইতে পারে।

'শিব শিব শিব শিব শিব—'

বলা যায় না, আবার মাকুন্দ দেখিয়া ফেলিতে পারেন; তাই রামবাবু চক্ষু বুজিয়া সবেগে দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন।

তারপরই—তুমুল ব্যাপার!

একটি অতিক্রান্তযৌবনা স্থূলাঙ্গী ঝি'র সহিত রামবাবুর সংঘর্ষ হইয়া গেল। হুলুস্থুল কাণ্ড! রামবাবু, ঝি, আলু, পটল, হাঁসের ডিম ফুটপাথে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে ঝি উঠিয়া কোমরে

হাত দিয়া তারস্বরে যে ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল তাহাতে রামবাবু দ্রুত উঠিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সশব্দে হুড়্‌কা লাগাইয়া দিলেন।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম জপ করিতে করিতে রামবাবু যখন আপিসে পৌঁছিলেন তখন বেলা পৌনে এগারোটা। পৌঁছিয়াই শুনিলেন বড় সাহেব তলব করিয়াছেন।

অষ্টমীর পাঁঠার মতো কাঁপিতে কাঁপিতে বামবাবু সাহেবের ঘরে গেলেন। সাহেব সংক্ষেপে বলিলেন, 'বার বার তোমাকে ওয়ানিং দিয়েছি, তবু তুমি সময়ে আসিতে পার না। তোমার আর আসিবার প্রয়োজন নাই।'

রক্ষাকবচের ভারে ডুবিয়া মরার মতো বিড়ম্বনা আব নাই। রামবাবু হোঁচট খাইতে খাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ যে এই রকম একটা কিছু ঘটিবে তাহা তিনি জানিতেন। পিছুটান, মাকুন্দ, কলিশন—এতগুলা দুর্দৈব কখনও ব্যর্থ হয়! তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর চোখ দুটি আকাশের পানে তুলিলেন।

একটা নূতন বাড়ি তৈয়ার হইতেছিল—লম্বা বাঁশের আগায় একটা ভাঙা ঝুড়ি ও ঝাঁটা বাঁধা ছিল, তাহাই রামবাবুর চোখে পড়িল।

তাঁহার মনে হইল অদৃষ্ট অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে ঝাঁটা দেখাইতেছে।

অলৌকিক

বর্ষা নামিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও বর্ষা নামে নাই। চারিদিকে আগুন ছুটিতেছে। দ্বিপ্রহরে তাপমান যন্ত্রের পারা অবলীলাক্রমে ১.৮° পর্যন্ত উঠিয়া যায়। মনে হয়, আর দু'চার দিন বৃষ্টি না নামিলে গয়া শহরের লোকগুলার অচিরাৎ গয়াপ্রাপ্তি ঘটিবে।

একটি পাকা বাড়ি। দ্বিপ্রহরে তাহার দরজা জানালা সব বন্ধ; দেখিলে সন্দেহ হয় বাড়ির অধিবাসীরা বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়াছে। কিন্তু আসলে তা নয়। বাড়ির যিনি কর্তা, তিনি গৃহিণী ও পুত্রবধূকে লইয়া দার্জিলিং পালাইয়াছেন বটে, কিন্তু বাকি সকলে বাড়িতেই আছে। ইহারা সংখ্যায় তিনজন। এক, কর্তার পুত্র সুনীল; সে কলেজের ছুটিতে বাড়ি আসিয়া বিরহ এবং গ্রীষ্মের তাপে দগ্ধ হইতেছে, কারণ বৌ দার্জিলিংয়ে। দুই সুনীলের বিবাহিতা ছোট বোন অনিলা। সে শ্বশুর বাড়ি হইতে অনেক দিন বাপের বাড়ি আসিয়াছে, শীঘ্রই শ্বশুর তাহাকে লইয়া যাইবেন, তাই সে দার্জিলিঙ যাইতে পারে নাই। তিন, তাহাদের ঠাকুরমা। বৃদ্ধা অতিশয় জবরদস্ত ও কড়া মেজাজের লোক, বাড়ি হইতে তাঁহাকে নড়ানো কাহারও সাধ্য নয়।

দ্বিতলের একটি ঘরে অনিলা দ্বার বন্ধ করিয়া আঁচল ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিজেকে বাতাস করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আর একটা ঘরে সুনীল লুঙ্গি পরিয়া গায়ে ভিজা গামছা জড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়াছিল। তাহার চক্ষু কড়িকাঠের দিকে, মন দার্জিলিঙ পাহাড়ে। দার্জিলিঙ পাহাড়ে গিয়াও মন কিন্তু তিলমাত্র ঠাণ্ডা হয় নাই।

দেহমনের উত্তাপে গামছা যখন শুকাইয়া যাইতেছে, তখন সে কুঁজোর জলে গামছা ভিজাইয়া আবার গায়ে জড়াইতেছে।

ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুটা বাজিল। এখনও চার ঘণ্টা এই বহ্নি প্রদাহ চলিবে; আকাশে সূর্যদেব ভস্মলোচন সন্ন্যাসীর মত একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন।

অনিলা আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। সুনীলের দরজায় করাঘাত করিয়া অবসন্ন কণ্ঠে ডাকিল,—'দাদা!'

সুনীল দরজা খুলিয়া দিল। দুই ভাই বোন কিছুক্ষণ ঘোলাটে চোখে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর সুনীল বলিল,— কি চাই?'

ক্লান্ত মিনতিভরা স্বরে অনিলা বলিল, 'দাদা, একটা কাজ করবে?'

সন্দিগ্ধভাবে সুনীল বলিল, 'কি কাজ?' এ অবস্থায় কাজের নাম শুনিলেই মন শঙ্কিত হইয়া ওঠে।

অনিলা বলিল, 'আমার গলায় দড়ি বেঁধে কুয়োতে চোবাতে পারো? তবু যদি একটু ঠাণ্ডা পাই।'

সুনীল একটু বিবেচনা করিয়া বলিল, 'চোবাতে পারি, কিন্তু তাতে আমার লাভ কি? আমার শরীর তো ঠাণ্ডা হবে না!'

অনিলা বলিল, 'তোমার শরীর ঠাণ্ডার দরকার কি? তোমার অর্ধাঙ্গিনী দার্জিলিঙে আছেন, তাঁকে চিঠি লেখো না, শরীর আপনি জুড়িয়ে যাবে।'

সুনীলের নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, সে বলিল, 'চিঠি লিখব। অর্ধাঙ্গিনীকে চিঠি লিখব! এ জন্মে আর নয়। অরুচি হয়ে গেছে।' ভিজা গামছা বুকে ঘষিয়া বক্ষস্থল কিঞ্চিত শীতল করিয়া বলিল, 'চিঠি লিখলেই যদি শরীর জুড়িয়ে যায়, তুই হেবোকে চিঠি লিখগে যা না।'

হাবু অনিলার স্বামীর ডাক-নাম। তাহাকে হেবো বলিয়া উল্লেখ

করিলে অনিলা চটিয়া যাইত, কিন্তু আজ তাহার রাগ হইল না। বস্তুতঃ স্বামীর চিঠি কয়েকদিন হইল আসিয়াছে, কিন্তু সে রাগ করিয়া উত্তর দেয় নাই। বিবাহিতা যুবতীদের এমনই স্বভাব, ক্লেশের কোনও কারণ ঘটিলেই তাঁহাদের সমস্ত রাগ পতিদেবতার উপর গিয়া পড়ে।

অনিলা বলিল, 'বাজে কথা বোলো না, ওর উপর আমার আর একটুও ইয়ে নেই। যদি কোনও উপায় থাকে তো বল।'

স্থনীল বলিল, 'একমাত্র উপায় যজ্ঞ করা। আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক সেদিন বলছিলেন, যজ্ঞ করলেই বৃষ্টি হয়—যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যঃ।'

অনিলার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'দাদা!'

স্থনীল বলিল, 'কি?'

অনিলা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, 'বড়ি!!'

স্থনীলের শঙ্কা হইল, গরমে অনিলার মাথার ঘিলু গলিয়া গিয়াছে, তাই সে এলোমেলো কথা বলিতেছে।

'বড়ি! কিসের বড়ি?'

'বড়ি বড়ি—বড়া বড়ির নাম শোননি কখনও?'

'শুনেছি। তা কি হয়েছে?'

'বলছি, ঠাকুরমা যদি বড়ি দেন, তাহলে নিশ্চয় বিষ্টি হবে। আজ পর্যন্ত কখনও মিথ্যে হয়নি।'

কথাটা সত্য। সেকালের ঋষিরা যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হইত কিনা এতকাল পরে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু ঠাকুরমা বড়ি দিলে বৃষ্টি নামিবেই। আজ পর্যন্ত ইহার অন্যথা হয় নাই। এ বিষয়ে ঠাকুরমার ব্যতিক্রমহীন রেকর্ড আছে। তিনি শেষ পর্যন্ত রাগ করিয়া বড়ি দেওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সুনীল একটু উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'বুদ্ধিটা মন্দ বার করিস নি। কিন্তু বুড়ীকে রাজি করানো শক্ত হবে।'

অনিলা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'চল না, দাদা, চেষ্টা করে দেখি। যেমন করে পারি রাজি করবো। আমার ডাল ভিজানো আছে। বড়ার অম্বল করব বলে ভিজিয়েছিলাম—'

সুনীল বলিল, 'আচ্ছা তুই এগো, আমি লুঙ্গিটা ছেড়ে যাচ্ছি।' ঠাকুরমা দু'চক্ষে লুঙ্গি পরা দেখিতে পারেন না, লুঙ্গি পরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে কার্যসিদ্ধি তো হইবেই না, অনর্থক বকুনি খাইতে হইবে।

নিচের তলায় ঠাকুর ঘরটি সবচেয়ে ঠাণ্ডা, কারণ এই ঘরে সংসারের পানীয় জলের ঘড়াগুলি থাকে। ঠাকুরমা মেঝেয় শুইয়া এক হাতে পাখা নাড়িতেছেন, অন্য হাতে মহাভারত বাগাইয়া ধরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। অনিলা প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ওমা, তুমি ঘুমোও নি দিদি! তা এই গরমে কি আর ঘুম হয়। পাখা নেড়ে নেড়ে হাতটা বোধ হয় ধরে গেছে। দাও, আমি বাতাস করছি।'

শিয়রের কাছে বসিয়া অনিলা ঠাকুরমার হাত হইতে পাখা লইয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল। ঠাকুরমার মুখখানি ঝুনা নারিকেলের মত, বাহিরে শুষ্ক হইলেও ভিতরে শাঁস আছে। তিনি নাতিনীর প্রতি একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। অনিলা বলিল, 'বাবাঃ, কি গরমই পড়েছে এবার, চিংড়িপোড়া হয়ে গেলুম। এমন গরম আগে আর কখনও পড়েনি।'

ঠাকুরমা বলিলেন, 'কেন পড়বে না, ফি বছরই পড়ে।'

এই সময় সুনীল প্রবেশ করিল; বিনা বাক্যব্যয়ে ঠাকুরমার পায়ের কাছে বসিল এবং তাঁহার একটা পা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া টিপিতে

আরম্ভ করিল। বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ঘাড় তুলিয়া বলিলেন, 'নেলো, ঠ্যাং ছেড়ে দে শিগ্‌গির। আজ তোদের হয়েছে কি?'

সুনীল বলিল, 'হবে আবার কি, কিছু না। সবাই বলে আজকাল-কার ছেলেমেয়েরা গুরুজনকে ভক্তিচ্ছেদ্দা করতে জানে না। তাই দেখিয়ে দিচ্ছি। গুরুজনের মত গুরুজন পেলেই ভক্তিচ্ছেদ্দা করা যায়' বলিয়া আরও প্রবলবেগে পা টিপিতে লাগিল।

অনিলা পাখা চালাইতে চালাইতে বলিল, 'যাই বল, মা বাবা শ্বশুর শাশুড়ী সকলেরই আছে; তাঁদের কি আমরা ভক্তি করি না? কিন্তু এমন ঠাকৃমা কটা লোকের আছে? আমাদের কী ভাগ্যি বল দেখি দাদা!'

ঠাকুরমা উঠিয়া বসিলেন, পর্যায়ক্রমে নাতি ও নাতিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া কড়া স্বরে বলিলেন, 'কি মতলব তোদের বল্ দিকি! ঠিক্ দুপুরবেলা আমাকে ছেঁদো কথা শোনাতে এলি কেন?'

সুনীল আহত স্বরে বলিল, 'কোথায় ভাবলাম, দুপুরবেলাটা বৃথাই কেটে যাচ্ছে, যাই ঠাকুরমার সেবা করিগে, তবু পরকালের একটা কাজ হবে। তা তুমি বলছ ছেঁদো কথা। তবে আর আমরা যাই কোথায়?' বলিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

অনিলা বলিল, 'শুধু কি তাই! বাবা দার্জিলিঙ থেকে চিঠি লিখেছেন —তোরা ঠাকুরমার দেখাশুনো করছিস তো! বাবা যদি এসে দেখেন—'

ঠাকুরমা ধমক দিয়া বলিলেন, 'আ গেল যা! ইনি আবার ঢাকের পেছনে ট্যামটেমি এলেন! যা বেরো আমার ঘর থেকে। দুটো ভূত-পেত্নী জুটেছে!

ভূত-পেত্নী কিন্তু নাছোড়বান্দা। সুনীল আবার ঠাকুরমার পা টানিয়া টিপিবার উপক্রম করিল। ঠাকুরমা অনিলার হাত হইতে পাখা

কাড়িয়া লইয়া সুনীলের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিলেন,—'তোরা যাবি, না আমার হাড় জ্বালিয়ে খাবি! বেরো শিগ্‌গির, আমি এখন দ্রৌপদীর রন্ধন উপাখ্যান পড়ছি।'

সুনীল এইরূপ একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল, বলিয়া উঠিল, 'দ্রৌপদীর রন্ধন উপাখ্যান। হুঁঃ, বন্ধনের কী জান্‌ত দ্রৌপদী? তোমার মতন বড়ি দিতে জান্‌ত?'

অনিলা অমনি বলিল, 'সে আর জানতে হয় না। দ্রৌপদী তো তস্য কালের মেয়ে, আজকালই বা কটা মেয়ে ঠাক্‌মার মতন বড়ি দিতে পারে? সরোজিনী নাইডু পারে? বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পারে?—আহা, সেই কবে ঠাক্‌মার বড়ি খেয়েছি, এখনও যেন মুখে লেগে আছে।'

সুনীল সশব্দে ঝোল টানিয়া বলিল, 'বলিস নি, বলিস নি, আমার ভিজে জল আসছে।'

ঠাকুরমার মনটা নরম হইল, কিন্তু সন্দেহ দূর হইল না। তিনি বলিলেন, 'নে, আর ন্যাকরা করতে হবে না, আসল কথাটা কী তাই বল্‌। কি চাস তোরা?'

সুনীল অবাক হইয়া বলিল, 'চাইব আবার কি, তোমার সেবা করতে চাই। তবে বড়ির কথায় মনে পড়ে গেল। কদ্দীন তোমার বড়ি খাইনি। দুটো বড়ি পাড়োনা দিদি।'

অনিল বলিল, 'হ্যাঁ দিদি, লক্ষ্মীটি দিদি, আমার ডাল ভিজানো আছে, আমি এক্ষুনি বেটে দিচ্ছি—'

কিছুক্ষণ ঠাকুরমার কলহ-কলিত কণ্ঠের সহিত নাতি-নাতিনীর করুণ মিনতি মিশ্রিত হইল; তারপর বৃদ্ধা পরাভূত হইলেন। কিন্তু আদৌ উহারা যে বড়ি পাড়াইবার মতলবেই আসিয়াছিল, তাহা ধরিতে পারিলেন না।

বেলা তিনটের সময় ঠাকুরমা তেল মাখানো থালায় কয়েকটি বড়ি পাড়িয়া রোদে দিলেন।

*   *   *

বেলা চারটের সময় আকাশের কোণে সিংহের মত স্ফীত কেশর কয়েকটা মেঘ মাথা তুলিল। দেখিতে দেখিতে গুরুগুরু ধ্বনির সহিত বর্ষণ শুরু হইয়া গেল। অতি ভৈরব হরষ, ক্ষিতিসৌরভ রভস, কিছুই বাদ পড়িল না। ঠাকুরমার বড়ি ভাসিয়া গেল।

কিন্তু ইহাই একমাত্র অলৌকিক ঘটনা নয়।

পুলক রোমাঞ্চিত রাত্রি। বৃষ্টির উদ্দাম প্রগলভতা কমিয়াছে; টিপিটিপি মেঘ-বধূরা যেন অভিসারে চলিয়াছে।

সুনীল নিজের ঘরে চিঠি লিখিতে বসিয়াছে—

প্রিয়তমাসু, আজ প্রথম বিষ্টি নেমেছে—অনিলা নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া চিঠি লিখিতেছে—

প্রিয়তমেষু—

আরব সাগরের রসিকতা

আরব দেশের হাস্যরসের সহিত পরিচয় নাই; কিন্তু একবার আরব সাগরের রসিকতার পরিচয় পাইয়াছিলাম।

অনেক দিন ধরিয়া আরব সাগরের তীরে বাস করিতেছি, কিন্তু এক দিনও সমুদ্র-স্নান হয় নাই। বন্ধুরা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন। গৃহিণীর আধুনিকা বান্ধবীরাও যে ভাবে কথা কহিতেছিলেন, তাহা তাঁহার শ্রুতিমধুর লাগিতেছিল না,—'এত দিন বম্বে'তে আছেন, সী-

বেদিং করেননি ?···ভয় করে বুঝি ? তা করবারই কথা—যারা আগে কখনো সমুদ্র দেখেনি, তাদের ভয় করবে বৈ কি।'

এক দিন গৃহিণী বলিলেন, 'ওগো, সমুদ্রে স্নান না করলে আর তো মান থাকে না। চলো এক দিন।'

আমি বলিলাম, 'বেশ তো, চলো। কিন্তু বেদিং কস্ট্যুম কিন্‌তে হবে যে।'

গৃহিণী উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'ওই বেহায়া পোশাক পরে আমি নাইবো ? কেটে ফেল্‌লেও না।'

'কিন্তু—'

গৃহিণী কিন্তু সতেজে ঐ বিলাতী বর্বরতা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি গঙ্গায় স্নান করিয়াছেন, পদ্মায় স্নান করিয়াছেন—সমুদ্রে তাঁহার ভয় কি ? তিনি বাঙালীর কুলবধূ, নিজের চিরাভ্যস্ত সাজ-পোশাকেই স্নান করিবেন। যে যা খুশি বলুক।

ভালোই হইল। বেদিং কস্ট্যুমের আজকাল দাম কম নয়। একটা দম্‌কা খরচ বাঁচিয়া গেল।

সমুদ্র আমার বাড়ি হইতে পোয়াটাক মাইল দূরে। ইতিপূর্বে কয়েক বার বীচে বেড়াইতে গিয়াছি; স্থানটা দেখাশুনা আছে। বেশ নির্জন স্থান; তবে সকালে-সন্ধ্যায় স্নানার্থীর ভিড় হয়। আমরা পরামর্শ করিয়া পরদিন ঠিক দুপুরবেলা বাহির হইলাম। এই সময়টায় ভিড় থাকে না। সমুদ্রের সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠতা একটু নিভৃতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখন জানিতাম না যে, সে দিন ঠিক দুপুরবেলাই জোয়ার আসিবার সময়।

বীচে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দিঙ্‌মণ্ডল পর্যন্ত সমুদ্র যেন মাতাল হইয়া টলমল করিতেছে! বড়-বড় ঢেউ বেলাভূমিকে আক্রমণ করিতেছে, বালুর উপর শুভ্র ফেনের একটা সীমা-রেখা আঁকিয়া দিয়া

ফিরিয়া যাইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ।

বীচে কেহ নাই। এপাশে-ওপাশে অনেক দূরে জলের মধ্যে দু'-একটা মুণ্ড উঠিতেছে নামিতেছে দেখিলাম। বীচের পিছনে নারিকেল-, কুঞ্জের মধ্যে একসারি ছোট ছোট কেবিন; যাহারা নিয়মিত সমুদ্র স্নান করিতে চায়, তাহারা ঐ কেবিন ভাড়া লয়। এক শ্বেতাঙ্গী যুবতী শিষ দিতে দিতে একটি কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে গোলাপী রঙের বেদিং কস্ট্যুম্, মাথায় রবাবের টুপি, কোমরে একটি বড় টাকিশ তোয়ালে জড়ানো। আমাদের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া নৃত্যচঞ্চল চরণে তিনি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

গৃহিণী চাপা তর্জনে বলিলেন, 'মরণ নেই বেহায়া ছুঁড়ির! খবরদার বল্‌ছি, ওদিকে তাকাবে না!'

হেঁটমুণ্ডে জলের দিকে চলিলাম। গৃহিণী শাড়ির আঁচল কোমরে জড়াইয়া লইলেন। ভাগ্যক্রমে আমি হাফ্ প্যাণ্ট্ পরিয়া আসিয়াছিলাম।

জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া গৃহিণী কিন্তু আর অগ্রসর হইতে চান না। আমারও সুবিধা বোধ হইতেছিল না। কিন্তু এত দূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। ওদিকে শ্বেতাঙ্গী তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে! ঢেউয়ের নাগর-দোলায় দোল খাইতেছে-যেন গোলাপী রঙের একটি মৎস্যনারী!

গৃহিণীকে বলিলাম, 'এসো, ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে কি সী-বেদিং হয়?'

জলের পানে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, 'ঢেউগুলো বড্ড বড় বড়!'

'তা হোক্ না—সমুদ্রের ঢেউ বড়ই হয়। ঐ দেখ না, ও মেয়েটা কেমন ঢেউ খাচ্ছে।'

'আবার ওদিকে তাকাচ্ছ?'

'না না, ও অনেক দূরে আছে। এখান থেকে বিশেষ কিছু দেখা যায় না।—এসো।'

হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে জলে লইয়া গেলাম। বেশি নয়, হাঁটু জল পর্যন্ত গিয়াছি কি, বিভ্রাট বাধিয়া গেল! প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আসিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল। গৃহিণী পড়িয়া গেলেন; ঢেউ তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। ঢেউ ফিরিয়া গেলে তিনি হাঁচোড় পাঁচোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই আর একটা ঢেউ আসিয়া আবার তাঁহাকে আছাড় মারিয়া ফেলিল। তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'ওগো আমাকে ধরো—আমি যে খালি পড়ে যাচ্ছি! কোথায় গেলে তুমি—আমাকে ফেলে পালালে?'

তাঁহাকে ধরিবার মতো অবস্থা আমার ছিল না। প্রথম গোটা দুই ঢেউ অতি কষ্টে সামলাইয়া গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তৃতীয় ঢেউটা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। ঢেউয়ের তলায় গড়াইতে গড়াইতে আমি প্রায় ডাঙায় গিয়া উঠিলাম। দু' এক ঢোক লোণা জলও পেটে গিয়াছিল। কোন মতে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখি, গৃহিণী তখনও এক হাঁটু জলে আছাড় খাইতেছেন। ঢেউগুলা এত দ্রুত পরম্পরায় আসিতেছে যে, তিনি পলাইয়া আসিতে পারিতেছেন না! তাঁহার কণ্ঠ হইতে অনর্গল চীৎকার নিঃসৃত হইতেছে, 'ওগো, কেমন মানুষ তুমি! আমাকে ফেলে পালালে! আমার যে কাপড় খুলে যাচ্ছে—'

শঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া দেখি, জলের মধ্যে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতেছে। সত্যই গৃহিণী বিবসনা হইতেছেন! ঢেউগুলা দুঃশাসনের মতো ছুটিয়া

আসিয়া তাঁহার বসন ধরিয়া টানিতেছে। আঁচল শিথিল হইয়া গেল! আর একটা ঢেউ—তিনি প্রাণপণে শাড়ির প্রান্ত আঁক্‌ড়াইয়া আছেন। আর একটা ঢেউ—ব্যস্! নারীর লজ্জা-নিবারণকারী শ্রীমধুসূদন বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন না; দুঃশাসনরূপী আবব সাগর গৃহিণীর শাড়ি কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মরিয়া হইয়া জলে লাফাইয়া পডিলাম। অনেক নাকানি-চোবানি খাইয়া শেষ পর্যন্ত গৃহিণীকে একান্ত নিরাবরণ অবস্থায় ডাঙায় টানিয়া তুলিলাম। তিনি নেহাত তন্বী ন'ন—কিন্তু যাক্!

চারি দিক্ ফাঁকা, কোথাও এতটুকু আড়াল-আবডাল নাই। উপরন্তু, ভোজবাজির মতো ঠিক এই সময় কোথা হইতে কতকগুলা লোক জুটিয়া গেল। তাহারা কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে দেখিতে নিজেদের ভাষায় (সম্ভবতঃ আরবী) মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-কালে পঞ্চপাণ্ডবের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে তাকাইলাম—হে মধুসূদন, তুমি কত দূরে!

হঠাৎ দেখি, দূর হইতে শ্বেতাঙ্গী মেয়েটা ছুটিয়া আসিতেছে। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে সে তাহার বড় তোয়ালেখানা গৃহিণীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।...

সে দিন তোয়ালে-পরিহিতা গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে কি করিয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম, সে প্রশ্ন করিয়া পাঠক আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে মনে চোখ বুজিয়া থাকেন!

✓ আদায় কাঁচকলায়

এতদিন যাহা শহরসুদ্ধ লোকের হাসি-ঠাট্টার বিষয় ছিল, তাহাই হঠাৎ অত্যন্ত ঘোরালো ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদা বাঁড়ুয্যের কন্যা নেড়ীকে লইয়া কাঁচকলা গাঙ্গুলীর পুত্র বদাই উধাও হইয়াছে। শুধু তাই নয়—

কিন্তু ব্যাপারটা আরও আগে হইতে বলা দরকার।

শহরের এক প্রান্তে নির্জন রাস্তার ধারে ঘেঁষাঘেঁষি দুটি বাড়ি। পঞ্চাশ বছর আগে শহরের পৌরসজ্ঘ বোধ করি হাত-পা ছড়াইবার মানসে এইদিকে হাত বাড়াইয়াছিল, তারপর কী ভাবিয়া আবার হাত গুটাইয়া লইয়াছে। অনাদৃত পথের পাশে কেবল দুটি বাড়ি একঘরে ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। পিছনে এবং সামনে ঘন জঙ্গল।

বাড়ি দুটি করিয়াছিলেন দুই বন্ধু। তাঁহারা বহুকাল গত হইয়াছেন, তাঁহাদের দুই ছেলে এখন বাড়ি দুটিতে বাস করিতেছেন এবং পৈতৃক বন্ধুত্বের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পবস্পর শত্রুতা করিতেছেন। শহরের লোক তাঁহাদের নামকরণ করিয়াছেন—আদা বাঁড়ুয্যে এবং কাঁচকলা গাঙ্গুলী।

কলহের কোনও হেতু ছিল না; একমাত্র গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বাস করাই কলহের কারণ বলিয়া ধবা যাইতে পারে। আদা বাঁড়ুয্যের ছাগল যদি কাঁচকলা গাঙ্গুলীর পালং শাকে মুখ দেয়, অমনি শহরে টি টি পড়িয়া যায়; আবার কাঁচকলা গাঙ্গুলীর একমাত্র বংশধর বদাই যদি বাঁড়ুয্যে-কন্যা নেড়ীকে জানালায় দেখিয়া চক্ষু মিটিমিটি করে, তাহা হইলে এই দুর্বৃত্ততার খবর কাহারও অবিদিত থাকে না। ভাগ্যক্রমে

দুইজনেই বিপত্নীক, নহিলে দুই গিন্নীর সঙ্ঘর্ষে পাড়ায় কাক-চিল বসিতে পাইত না।

মহকুমা শহর, আকারে ক্ষুদ্র; চারিদিকে জঙ্গল। মাঝে মাঝে চুরি-ডাকাতিও হয়। আদা বাঁড়ুয্যে পৌরসঙ্ঘের কেরানী। দীর্ঘকাল কেরানীগিরি করিয়া তাঁহার শরীর কৃশ ও মেজাজ রুক্ষ হইয়াছে। উপরন্তু বাড়িতে অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা এবং পাশের বাড়িতে অবিবাহিত শত্রুপুত্র। বাঁড়ুয্যের বদ্-মেজাজের জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কাঁচকলা গাঙ্গুলীর শহরে একটি মনিহারীর দোকান আছে। হৃষ্ট-পুষ্ট মজবুত চেহারা, গালভরা হাসি। বাঁড়ুয্যে ছাড়া আর কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ নাই। সকলের সঙ্গেই দাদা-ভাই সম্পর্ক।

দু'জনেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অতি সাধারণ অবস্থা।

আদা বাঁড়ুয্যে সকালবেলা আপিস যান; পথে যাইতে হয়তো দেখেন কাঁচকলা গাঙ্গুলীর দোকানের সামনে কয়েকজন ছোকরা উত্তেজিতভাবে জটলা করিতেছে। গাঙ্গুলীর দোকানে প্রত্যহ সকালবেলা খবরের কাগজের আড্ডা বসে; কিন্তু আজ যেন উত্তেজনা কিছু বেশী। নানা-প্রকার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে, গাঙ্গুলীও দোকানে থাকিয়া আলোচনায় যোগ দিয়াছেন। একজন ছোকরা বাঁড়ুয্যেকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠে—'এই যে বাঁড়ুয্যে-দা, খবর শুনেছেন? পেরুমল মারোয়াড়ীর গদিতে কাল রাত্রে ডাকাতি হয়ে গেছে।'

বাঁড়ুয্যে স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষতার সহিত বলেন—'বটে, ডাকাত ধরা পড়েছে?'

একজন বলে—'ডাকাত কোথায়, পুলিশ পৌঁছুবার আগেই পেরুমলের যথাসর্বস্ব নিয়ে কেটে পড়েছে।'

বাঁড়ুয্যে বলেন,—'পুলিশের চোখ থাকলে ডাকাত ধরতে পারত।

এ শহরে ডাকাতের মত চেহারা কার তা সবাই জানে।' বলিয়া গাঙ্গুলীর দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া চলিতে আরম্ভ করেন।

ছেলেরা হাসিয়া ওঠে। গাঙ্গুলী দোকান হইতে গলা বাড়াইয়া বলেন, 'তোমাদের বাড়ি থেকে যদি কখনো ঘটি-বাটি চুরি যায়, কে চুরি করেছে বলতে হবে না। ছিঁচকে চোরের মত চেহারা শহরে একটাই আছে।'

বাঁড়ুয্যে শুনিতে পাইলেও কানে তোলেন না, হন্ হন্ করিয়া আপিসের দিকে চলিয়া যান।

এইভাবে চলিতেছে। কলহের কটুকাটব্য কখনও বা থানা পর্যন্ত পৌঁছয়। থানার দারোগা উভয়ের পরিচিত, সহাস্য সহানুভূতির সহিত নালিশ চাপা দেন।

কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপর্যুপরি দুইটি ঘটনা ঘটিয়া শহরসুদ্ধ লোককে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় পোস্ট আপিসের ঠেলাগাড়ি চিঠিপত্র লইয়া স্টেশনে যায়। স্টেশন ও ডাকঘরের মাঝে মাইলখানেক রাস্তার ব্যবধান; তাহার মধ্যে খানিকটা রাস্তা জঙ্গলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। সেদিন ঠেলাগাড়ি যথাসময়ে স্টেশনে যাইতেছিল, সঙ্গে ছিল তিনজন পিওন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ একটা মুখোশ-পরা ডাকাত দমাদ্দম বোমা ফাটাইতে ফাটাইতে তাহাদের আক্রমণ করিল; তাই দেখিয়া পিওন তিনজন ঠেলাগাড়ি ফেলিয়া থানার অভিমুখে ধাবিত হইল।

পুলিশ আসিয়া দেখিল, বোমারু ডাকাত একটি ব্যাগ কাটিয়া রেজেস্ট্রি ইন্সিওরের খামগুলি লইয়া গিয়াছে। একজন পিওন দূর হইতে ডাকাতকে দেখিয়াছিল, মুখ দেখিতে না পাইলেও চেহারাটা

তাহার চেনা-চেনা মনে হইয়াছিল। অনেকটা যেন কাঁচকলা গাঙ্গুলীর মত।

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় দারোগা সদলবলে গাঙ্গুলীর বাড়িতে হানা দিলেন। গাঙ্গুলী সরকারী মেল-ব্যাগ লুঠ করিয়াছেন, একথা পুরাপুরি বিশ্বাস না করিলেও একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দারোগা যে ব্যাপার দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। গাঙ্গুলীর দরজার সম্মুখে বাঁড়ুয্যে এবং গাঙ্গুলীতে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে। উভয়ে পরস্পরকে যে ভাষায় সম্বোধন করিতেছেন, তাহা ভদ্রসমাজে অপ্রচলিত। দুজনের হাতেই লাঠি। লাঠালাঠি বাধিতে আর দেরী নাই।

দারোগাকে দেখিয়া বাঁড়ুয্যে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। বলিলেন,—'দারোগাবাবু এসেছেন, ধরুন ব্যাটাকে। কড়াকড় করে বেঁধে নিয়ে যান।'

হতভম্ব দারোগা বলিলেন—'কী হয়েছে?'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'আমার সর্বনাশ করেছে হতভাগা। বাপ-ব্যাটায় সড করে আমার মেয়েকে কুলত্যাগিনী করেছে। আমার জাত মেরেছে।'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'মিছে কথা—মিছে কথা। আমার ছেলে একটা পঞ্চাননর গাড়িতে বর্ধমান গেছে মামার বাড়িতে। কোন্ শালা বলে—' ইত্যাদি।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'দারোগাবাবু, এই দেখুন চিঠি। আমার মেয়ে কি লিখে রেখে গেছে দেখুন।'—

দারোগা চিঠি পড়িলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

বাবা,

গাঙ্গুলী মশাইয়ের ছেলের সঙ্গে তুমি তো আমার বিয়ে দেবে না, তাই আমি ওর সঙ্গে পালিয়ে চললুম। প্রণাম নিও।

ইতি—নেড়ী।

দারোগা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'আপনার মেয়ে নাবালিকা নয়। সে যদি নিজের ইচ্ছেয় কারুর সঙ্গে পালিয়ে থাকে, আমরা কিছু করতে পারি না। আপনি কখন জানতে পারলেন?'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—'ছটার সময় আপিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, এই চিঠি রয়েছে, মেয়ে নেই। ঐ নচ্ছার গাঙ্গুলীটা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল, দোর ঠেলাঠেলি করে বার করলুম। এতবড় বেহায়া, বলে তোমার মেয়ের খবর আমি জানি না, আমার ছেলে মামার বাড়ি গেছে। চোর—ডাকাত—বোম্বেটে—'

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সেই ছ'টা থেকে আপনারা ঝগড়া করছেন।'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'সেই ছ'টা থেকে; এখনও জল দিই নি মুখে। আমার গায়ে যদি জোর থাকত, ঘাড় ধরে শালাকে থানায় নিয়ে যেতুম।'

দারোগা চিন্তা করিলেন। রাস্তায় ডাকাতি হইয়াছে সাতটার সময়। এদিকে আদা ও কাঁচকলার ঝগড়া বাধিয়াছে ছটার সময়। সুতরাং পিওনটা ভুল করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবু—

দারোগা বলিলেন,—'গাঙ্গুলী মশাই, আপনার বাড়ি আমরা থানা-তল্লাশ করব।'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'আসতে আজ্ঞা হোক। আতিপাতি করে খুঁজে দেখুন, ওর মেয়ের গন্ধ যদি আমার বাড়িতে পান, আমি বেগের গাঙ্গুলী নই।'

দারোগা ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ গাঙ্গুলীর বাড়ি তল্লাশ করিল। দারোগা অবশ্য বাঁড়ুয্যে-কন্যাকে খুঁজিতেছিলেন না; কিন্তু তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহাও পাওয়া গেল না। চোরাই ইন্সিওর চিঠিগুলির চিহ্নমাত্র গাঙ্গুলীর বাড়িতে নাই। প্রস্থানকালে দারোগা বলিলেন, 'গাঙ্গুলী মশাই, কিছু মনে করবেন না, আপনার উপর অন্য কারণে সন্দেহ হয়েছিল। শত্তুরের সাক্ষীতে আপনি বেঁচে গেলেন।'

গাঙ্গুলী ও বাঁড়ুয্যে যুগপৎ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * *

গভীর রাত্রে বাঁড়ুয্যের দরজায় টোকা পড়িল।

বাঁড়ুয্যে দ্বার খুলিয়া বলিলেন,—'এস ভাই – এস।'

আদা বাঁড়ুয্যে কাঁচকলা গাঙ্গুলীর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে তক্তাপোশে বসাইলেন। তক্তাপোশের উপর অনেকগুলি ইন্সিওর খাম খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল। বাড়ুয্যে বলিলেন,—'কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেড় হাজার টাকা হল। তাই বা মন্দ কি?

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'হ্যাঁ, ওই টাকায় বদাই কলকাতায় মনিহারীর দোকান খুলতে পারবে।'

উভয়ে মধুর হাস্য করিলেন। বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—'তারপর—কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো?'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'কিচ্ছু না। দুটো পট্‌কা ছুঁড়তেই পিওন ব্যাটারা মাল ফেলে পালাল।'

'কিন্তু পুলিশ গন্ধ পেয়েছিল।'

'হুঁ। ভাগ্যিস অ্যালিবাই তৈরী করা গেছল!—কিন্তু এবার উঠি। খামগুলো পুড়িয়ে ফেলো বেহাই।'

'সে আর বলতে'—বাঁড়ুয্যে অন্যমনস্কভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, - 'বিয়েটা দেখতে পেলুম না এই শুধু দুঃখু।'

গাঙ্গুলী ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন,—'পৌনে বারোটায় লগ্ন। তার মানে এতক্ষণ সম্প্রদান হয়ে গেছে। তা দুঃখ কি বেহাই, কালই না হয় বর্ধমানে গিয়ে মেয়ে-জামাই দেখে এস। আমার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা তো তুমি জানোই।'

বাঁড়ুয্যের মুখ আবার প্রফুল্ল হইল। তিনি উঠিয়া গাঙ্গুলীকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন,—'বেহাই, আমি মেয়ের বাপ, আজ তো আমারই খাওয়াবার কথা। তোমার জন্যে ভাল মিষ্টি এনে রেখেছি। চল, খাবে চল।'

ইচ্ছাশক্তি

মনস্তত্ত্বের এক প্রচণ্ড পণ্ডিত বলিলেন, 'ইচ্ছাশক্তির দ্বারা হয় না এমন কাজ নেই। যদি মরীয়া হয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারো, যা চাইবে তাই পাবে। কোনও কাজ করতে হবে না, স্রেফ্ মনের ইচ্ছাটাকে প্রবল একাগ্র দুর্নিবার করে তুলতে হবে। সেকালের মুনি-ঋষিরা কথাটা জানতেন, তাই রামায়ণ-মহাভারতে এত বর দেওয়া আর শাপ দেওয়ার ছড়াছড়ি।'

পণ্ডিতের কথা সত্য কিনা পরীক্ষা করার প্রয়োজন যত না থাক, নিজের মনে একটা বাসনা লুব্ধভাবে কিছুদিন আনাগোনা করিতেছিল। এমন কিছু জোরালো বাসনা নয়—ভাসা ভাসা একটা আকাঙ্ক্ষা। ভাবিলাম, দেখাই যাক্ না, কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি খরচ করিয়া যদি কাম্যবস্তু পাওয়া যায়, মন্দ কি?

কাম্য বস্তুটি অবশ্য এমন কিছু অপ্রাপ্য বস্তু নয়—একটি ফাউণ্টেন পেন্। আমি লেখক; স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, আমি ফাউণ্টেন পেন্ ভালোবাসি। আমার একটি ফাউণ্টেন পেন্ আছে; যুদ্ধের আগে কিনিয়া ছিলাম। এখনও বেশ ভালোই চলিতেছে। কিন্তু যাহা ভালোবাসি তাহা একটিমাত্র লইয়া কি মন ভরে? সেকালের রাজারা এতগুলি করিয়া বিবাহ করিতেন কেন? বড মানুষেরা অনেক টাকা থাকা সত্ত্বেও আরও টাকা চায় কেন? আমার মন চাহিতেছিল—আর একটি কলম। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে ফাউণ্টেন পেনের দাম যেরূপ চড়িযা গিয়াছে তাহাতে আমার মতো লেখক তো দূরের কথা, হায়দ্রাবাদের নিজাম ছাড়া আর কেহ কলম কিনিতে পারে বলিয়া তো মনে হয় না।

সুতরাং জোরসে ইচ্ছাশক্তি লাগাইয়া দিলাম। মনে মনে এই আশা উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল: আমি লেখক; এমন কিছু মন্দ লিখি না; নিজামের মতো কোনও ব্যক্তি যদি আমাকে একটি ফাউণ্টেন পেন্ উপহারই দেন, তবে কি এতই অপাত্রে পডিবে?

কি করিয়া ইচ্ছাশক্তিকে একাগ্র ও দুর্নিবাব করিয়া তোলা যায় তাহার প্রক্রিয়া জানা না থাকিলেও, এঁটুলির মতো তাহার গায়ে লাগিয়া রহিলাম। দিবারাত্র কলমের চিন্তা করিতেছি—কলম চাই, কলম চাই—ইহা ছাড়া অন্য চিন্তা নাই। আমি বড় একরোখা লোক; যখন ধরিয়াছি তখন ইহার শেষ দেখিয়া ছাড়িব।

কয়েকদিন এই ভাবে কাটিল, কিন্তু কলমের দেখা নাই। একদিন একটা পারিবারিক প্রয়োজনে বাড়ির বাহির হইতে হইল। কিন্তু মনটা ইতিমধ্যে এমনই একগুঁয়ে হইয়া উঠিয়াছিল যে ট্রাম-বাসের গুঁতো-গুঁতির মধ্যেও কলমের চিন্তা ছাড়িল না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার নিজের কলমটি কে কখন বুকপকেট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলাম; তারপর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল। কোথায় আমি 'কলম দেহি কলম দেহি' করিয়া মনে মনে মাথা খুঁড়িতেছি, আর আমার নিজের কলমটাই কোন্ শ্যালকপুত্র হাত সাফাই করিল! রাম এমন উল্টা বোঝে কেন? দুত্তোর ইচ্ছাশক্তি! মনস্তত্ত্বের পণ্ডিতটার দেখা পাইলে হয়, তাহার মাথা ফাটাইয়া দিব।

কয়েকদিন বড়ই মন খারাপ গেল। তারপর হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে ডাকযোগে একটি পার্শেল পাইলাম।

পার্শেলের মধ্যে একটি ফাউন্টেন পেন্ ও চিঠি।

অপরিচিত ব্যক্তিটি লিখিয়াছেন যে, তিনি আমার লেখার অনুরাগী পাঠক—অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ এই কলমটি আমাকে উপহার দিতেছেন, আমি উহা ব্যবহার করিলে ধন্য হইবেন।

কলমটি কাগজের খাপ হইতে বাহির করিয়া দেখিলাম, ঠিক আমার হারানো কলমের জোড়া! তবে নূতন—বেশ তক্তক্ ঝক্ঝক্ করিতেছে।

হঠাৎ মনে কেমন খটকা লাগিল। অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, কলমের গায়ে একটি দাগ রহিয়াছে—যেমন আমার কলমটিতে ছিল!

ইচ্ছাশক্তির এ কিরকম রসিকতা!

আমারই চোরা কলম কোনও ভদ্রলোক সস্তায় ক্রয় করিয়া, মাজিয়া ঘষিয়া নূতন বাক্সে পুরিয়া আমাকেই উপহার দিয়াছেন।

পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয় নাই, হইলে জিজ্ঞাসা করিব, ইচ্ছাশক্তি এমন জুয়াচুরি করে কেন?

এপিঠ ওপিঠ

তরুণ আই-সি-এস্ সুখেন্দু গুপ্ত প্রেমে পড়িয়াছে ; তাহার ইস্পাতের ফ্রেমে-আঁটা মজবুত হৃদয় নড়্‌বড়ে হইয়া গিয়াছে।

শুধু প্রেমে পড়িলে দুঃখ ছিল না ; কিন্তু এই চিত্তবিকারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। বিলাতে থাকাকালীন সে ডুবিয়া ডুবিয়া কয়েক ঢোক জল খাইয়াছিল, সেই অনুতাপের জ্বালা আজ তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।

সুখেন্দু ছেলে খারাপ নয়। তবে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, অতিবড় সাধু ব্যক্তিরও মাঝে মাঝে পা পিছলাইয়া যায়। বিশেষতঃ বিলাতের পথঘাট একটু বেশি পিছল ; তাই সুখেন্দুর পদস্খলনকে আমাদের উদার-চক্ষে দেখিতে হইবে। আমাদের একটা বদ্‌অভ্যাস আছে, ঐ জাতীয় ত্রুটিকে আমরা একটু বড় করিয়া দেখি এবং ক্রমাগত সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে থাকি। যাঁহারা বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা কিন্তু এ বিষয়ে ঢের বেশি সংস্কার-মুক্ত।

যাহোক্, সুখেন্দুর মনস্তাপ যে আন্তরিক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে সে গোটা হৃদয় লইয়াই দেশে ফিরিয়াছিল। তারপর তিন বছর কাটিয়াছে ; হৃদয় কোনও গোলমাল করে নাই। বাংলাদেশের এক মহকুমায় সগৌরবে রাজত্ব করিতে করিতে অন্য এক মহকুমায় বদলি হওয়া উপলক্ষে কিছুদিনের ছুটি পাইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। এখানে আসিয়াই তাহার হৃদয় হঠাৎ জ্যাতিকলে পড়িয়া গিয়াছে।

যুবতীটির নাম এণা ; বাংলা সরকারের একজন মহামান্য অফিসারের কন্যা। বয়স কুড়ি হইতে বাইশের মধ্যে—তন্বী, রূপসী, কুহকময়ী—

এণা সত্যই অনন্য। সে গভর্ণরের পার্টিতে বল্‌নাচ নাচিতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোথাও প্রগল্‌ভতার ইশারা পর্যন্ত নাই ; কথায় বার্তায় সে পরম নিপুণা, কিন্তু তাহার প্রকৃতিটি বড় মোলায়েম ; সে ইংরেজিতে রসিকতা করিতে পারে, আবার বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী গাহিয়া চিত্তহরণ করিতেও জানে। দর্পণে সে যে দেহটি দেখিতে পায় তাহা যৌবনের অকলঙ্ক লাবণ্যে ঝলমল, কিন্তু দর্পণে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না সেই অন্তরটি কত নিবিড় রহস্যের জালে ছায়াময় হইয়া আছে তাহা কে অনুমান করিবে ?

প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সুখেন্দুর ঘাড় মুচড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর কোনও আশা ছিল না। ওদিকে অপর পক্ষও একেবারে অনাহত অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। সুখেন্দু অতি সুপুরুষ এবং অত্যন্ত স্মার্ট্‌ ; কোনও দিক দিয়াই তাহার যোগ্যতায় এতটুকু খুঁত ছিল না। তাই অন্তরের গহন বনে এণাও বিলক্ষণ ঘা খাইয়াছিল।

তারপর আলাপ যত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, দু'জনের মধ্যে আকর্ষণও তেমনি দুর্নিবার হইয়া উঠিল। মুখের কথা যখন সাধারণ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে, চোখের ভাষা তখন আকাঙ্ক্ষায় তৃষিত হইয়া উঠে। চোখের ভাষা নীরব হইলে কি হইবে, উহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। সুখেন্দু দেখিতে পায়, এণার নরম চোখ দুটি মিনতিভরা উৎকণ্ঠায় তাহার স্বীকারোক্তির প্রতীক্ষা করিয়া আছে ; এণা দেখে, সুখেন্দুর ঠোঁটের কাছে কথাগুলি কাঁপিতেছে, কিন্তু তাহারা আবেগের বাঁধনহারা প্লাবনে বাহির হইয়া আসে না। লগ্নভ্রষ্ট হইয়া যায়। সুখেন্দু বিরসমুখে অন্য কথা পাড়ে।

এইভাবে কয়েকটা অন্তর্গূঢ় অগ্নিগর্ভ দিন কাটিয়া গেল, সুখেন্দুর ছুটি ফুরাইয়া আসিল।

আর সময় নাই ; দুদিন পরেই তাহাকে কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অথচ যে কথাটি বলিবার জন্য তাহার অন্তরাত্মা আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাহা সে কিছুতেই বলিতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয় মন্থন করিয়া অনুতাপের হলাহল বাহির হইয়াছে। যতবার সে বলিবার জন্য মুখ খুলিয়াছে ততবার বিবেক আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে নিজের কক্ষে উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারি করিতে করিতে সুখেন্দু ভাবিতেছিল, 'কি করি! আমি জানি ও আমাকে চায়—কিন্তু—ওকে ঠকাবো? না না, অনাঘ্রাত ফুলের মতো ওর মন, অনাবিদ্ধ রত্নের মতো ওর দেহ। আর আমি! না—কিছুতেই না।'

মন স্থির করিয়া সুখেন্দু চিঠি লিখিতে বসিল। মুখে যাহা ফুটি-ফুটি করিয়াও ফোটে না, কাগজে কলমে তাহা ভালোই ফোটে।

'—আমি তোমাকে ভালোবাসি।

'একথা জানতে তোমার বাকি নেই। আমিও তোমার চোখের নীরব বার্তা পেয়েছি, বুঝতে পেরেছি তোমার মন। কিন্তু তবু মুখ ফুটে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারিনি। আমার অপরাধী মন কুণ্ঠায় নীরব থেকেছে।

'তোমাকে আমি ঠকাতে পারবনা। যা কোনও দিন কারুর কাছে স্বীকার করিনি, আজ তোমাকে জানাচ্ছি। বিলেতে যখন ছিলুম তখন একেবারে নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করতে পারিনি। কিন্তু তখন তো তোমাকে চিনতুম না। ভাবিও নি যে তোমার দেখা পাব।

'ক্ষমা করতে পারবে না কি? শুনেছি ভালোবাসা সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারে। যদি ক্ষমা করতে পারো, চিঠির জবাব দিও। যদি না পারো—বিদায়। আমার হৃদয় চিরদিন তোমারই থাকবে।'

চিঠি ডাকে পাঠাইয়া দিয়া সুখেন্দু হোটেলেই বসিয়া রহিল; সেদিন আর কোথাও বাহির হইতে পারিল না।

পরদিন বিকালে চিঠির উত্তর আসিল।

'—তুমি এসো—শিগ্‌গির এসো। দু'দিন তোমাকে দেখিনি।

'তুমি তোমার মনের গোপন কথা বলতে পেরেছ—তাতে আমারও মনের রুদ্ধ কবাট আজ খুলে গেছে। আজ আর আমার লজ্জা নেই; নিজের মন দিয়ে বুঝেছি, ভালোবাসা সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারে।

'আমিও জীবনে একবার ভুল করেছি। কিন্তু আজ তা মনে হচ্ছে কোন্ জন্মান্তরের দুঃস্বপ্ন।

'তুমি লিখেছ তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমিও পারলুম কৈ? আর ক্ষমা! তুমি এসো—তখন ক্ষমার কথা হবে।'

* * *

উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মেল ট্রেন রাত্রির অন্ধকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।

একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় সুখেন্দু নিজের বাঙ্কে শুইয়া একদৃষ্টে আলোর পানে তাকাইয়া আছে; নির্বাপিত পাইপটা ঠোঁটের কোণ হইতে ঝুলিতেছে।

গভীর রাত্রি; কামরায় আর কেহ নাই।

সুখেন্দু পাইপটা বালিশের তলায় রাখিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিল; তারপর যেন অন্ধকারকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, 'বাপ! খুব বেঁচে গেছি!'

কুতুব-শীর্ষে

দুইজনে লুকাইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম যে সন্ধ্যার সময় কুতুব মিনারের ডগায় উঠিয়া নিরালায় দেখা সাক্ষাৎ করিব। প্রণয়ী যুগলের নিভৃত মিলনের পক্ষে এমন উচ্চস্থান আর কোথায় আছে? এখান হইতে নিচের দিকে তাকাইলে মানুষগুলাকে পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর দেখায়।

তা ছাড়া, অন্য একটা কারণও ছিল। কুমারী বিন্ধ্যেশ্বরীর অর্থাৎ আমার বিন্দুর পিতা মহামহোপাধ্যায় জটাধর শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে পছন্দ করিতেন না। বিন্দুর সহিত বিন্দুর পূজ্যপাদ পিতার এই মতভেদের কারণ—আমি নাকি পরিপূর্ণভাবে সাহেব বনিয়া গিয়াছি; মনুষ্যত্ব এবং আরও কয়েকটা ষত্বণত্ব আমার একেবারেই লোপ পাইয়াছে। তাই আমাকে বিন্দুর সান্নিধ্যে দেখিলেই মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের শুঁয়াপোকার মতো জ্রূযুগল কপালের উপর কিলবিল করিয়া উঠিত। এবং তিনি গলার মধ্যে অস্ফুটস্বরে যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করিতেন তাহা দেবভাষা হইলেও সম্পূর্ণ প্রসাদগুণবর্জিত বলিয়াই আমার সন্দেহ হইত। শাস্ত্রী মহাশয় গোঁড়া হিন্দু, সুতরাং জবরদস্ত লোক—সম্প্রতি একটা প্রকাণ্ড কলেজের প্রধান সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর লইয়া একান্তমনে কেবল কন্যাকে আগলাইতেছেন।

বিন্দুর বয়স আঠারো বৎসর; গোঁড়া হিন্দু শাস্ত্রী মহাশয় ইহা কিরূপে সহ্য করিতেছেন, প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার সহজ উত্তর আছে—ফলিত জ্যোতিষ মতে উনিশ বছর বয়সে বিন্দুর একটি প্রচণ্ড ফাঁড়া আছে, সেই ফাঁড়া উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জটাধর শাস্ত্রী কন্যার বিবাহ

দিবেন না। তিনি কেবল তাহাকে হবিষ্য আহার করাইয়া বেদান্ত পড়াইতেছেন।

গতিক বুঝিয়া আমরা লুকাইয়া দেখা-শুনা আরম্ভ করিয়াছিলাম—কিন্তু তাহা এতই ক্ষণস্থায়ী যে তৃপ্তি হইত না। শেষে বিন্দুই এই মতলবটি বাহির করিয়াছিল। হবিষ্যান্ন ও বেদান্তের দ্বারা বুদ্ধি সম্ভবতঃ মার্জিত হয়; কুতুব মিনারের শীর্ষে দেখা করিবার চাতুরী তাহার মস্তিষ্কেই উৎপন্ন হয়। ইহার পরম সুবিধা এই যে, জটাধর শাস্ত্রী কন্যাকে লইয়া সন্ধ্যা ভ্রমণ উপলক্ষে কুতুব মিনারের মূল পর্যন্ত পৌঁছিবেন, কিন্তু তিনি বিপুলকায় ও বৃদ্ধ—কুতুব মিনারের ডগায় ওঠা তাঁহার কর্ম নয়; কন্যাটি তন্বী ও নবযৌবনা—সে পিতাকে নিচে ফেলিয়া ক্রীড়াচ্ছলে হাসিতে হাসিতে চক্রায়িত সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিয়া যাইবে। আর আমি পূর্ব হইতেই উপরে অপেক্ষা করিয়া থাকিব—

কৌশলটা বুঝিতে পারিয়াছেন?

কিন্তু এ কৌশলটাই এই কাহিনীর চরম প্রতিপাদ্য নয়—মুখবন্ধ মাত্র। কুতুব শীর্ষে যাহা ঘটিয়াছিল (রোমাঞ্চকর কিছু নয়; পাঠক পাঠিকা অযথা উৎসাহিত হইয়া উঠিবেন না) তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য। অবশ্য ঘটনার অকুস্থল যে দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠস্থিত স্বনামখ্যাত স্তম্ভ তাহা বোধ করি এতক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

যথাকালে দুই পকেটে নানাবিধ বিজাতীয় মিষ্টান্ন ভরিয়া লইয়া কুতুব-শীর্ষে আরোহণ করিলাম। একটু আগে ভাগে আসাই সমীচীন; ভাবী শ্বশুরমহাশয়ের সহিত মুখোমুখি দেখা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।

উপরে উঠিয়া কিন্তু দেখিলাম, আমারও আগে আর একজন এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে! অপরিচিত একজন ছোকরা সাহেব। আমাকে দেখিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল।

ছোকরা আমারই সমবয়স্ক হইবে। সাধারণতঃ ইংরেজদের চেহারা যেমন হয়—নাক মুখ ভালো নয়, অথচ বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ। অন্য সময় হইলে অবিলম্বে তাহার সহিত আলাপ জমাইয়া ফেলিতাম; কিন্তু এ সময়ে তাহাকে দেখিয়া মনটা খিঁচড়াইয়া গেল। তুমি বাপু কিজন্য এখানে আসিয়া উঠিলে? ভারতবাসীর সুখে বিঘ্ন করা ছাড়া আর কি তোমাদের অন্য কাজ নাই?

আকাশের মাঝখানে গোলাকৃতি চত্বর, কোমর পর্যন্ত পাঁচিল দিয়া ঘেরা—যেন প্রণয়-পাখীর নিভৃত একটি নীড়। এখানে ঐ বস্তুতান্ত্রিক ইংরেজ পাষণ্ড কী করিতেছে। বিন্দুর জন্য যে চকোলেট আনিয়াছিলাম বিমর্ষভাবে তাহাই কয়েকটা খাইয়া ফেলিলাম। লোকটা চলিয়াও তো যায় না! একটু বুদ্ধি থাকিলে আমার অবস্থা বুঝিয়া নিজেই ভদ্রভাবে নামিয়া যাইত। কিন্তু কেবল ষাঁড়ের ডালনা খাইলে বুদ্ধি আসিবে কোথা হইতে?

লক্ষ্য করিলাম, সে ঘাড় ফিরাইয়া মাঝে মাঝে দেখিতেছে আমি চলিয়া গিয়াছি কিনা। বোধ হয় কালা আদমি কাছে থাকার জন্য সাহেবের কষ্ট হইতেছে। উঃ! এই পাপেই তো আর্যাবর্ত ইহাদের হাত হইতে যাইতে বসিয়াছে।

কিন্তু আমি যে রাগ করিয়া নামিয়া যাইব তাহারও উপায় নাই—বিন্দু আসিবে। নিচে—স্তম্ভের কটি বেষ্টন করিয়া আরও কয়েকটি রেলিং ঘেরা ব্যাল্‌কনি আছে বটে, কিন্তু সেখানে বিন্দুর সহিত একত্র দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বড় বেশি। শাস্ত্রী মহাশয় চক্ষুতে নিয়মিত সর্ষপ তৈল প্রয়োগ করিয়া দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অনাবশ্যক বজায় রাখিয়াছেন।

সিঁড়ির উপর দ্রুত লঘু পায়ের শব্দ! পরক্ষণেই বিন্দুর কৌতুক-

হাসি-ভরা মুখ। তারপরই বিন্দুর হাসি মিলাইয়া গেল। সে থমকিয়া সাহেবের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'এ আবার কে ?'

বলিলাম, 'একটা নৃশংস ইংরেজ। ইচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে সটান রেলিং ডিঙিয়ে ওকে তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিই।'

বিষণ্ণভাবে বিন্দু আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজনে শূন্যের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছি। পকেট হইতে সমস্ত টফী. চকোলেট ও ক্যারামেল্ বাহির করিয়া বিন্দুকে দিলাম। তাহার মুখে হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু ম্রিয়মান হাসি। ক্ষুব্ধ মুখে সে টফী চিবাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'আজকের দিনটাই বৃথা গেল।'

বিন্দু বলিল, 'বাবাকে এদিকে আনতে যে কত কষ্ট পেতে হয়েছে !—'

বুঝিতে পারিলাম, পিতৃদেবতাকে কুতুব মিনারের সন্নিকটে আসিতে রাজি করা বিন্দুর পক্ষে সহজ হয় নাই। এত আয়োজন, এত কৌশল—সব ব্যর্থ ! আমি কট্‌মট্ করিয়া সাহেবের দিকে তাকাইলাম।

এই সময় সাহেব একবার ঘাড় বাঁকাইয়া আমাদের দিকে চাহিয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। বিন্দু এতক্ষণ তাহার মুখ দেখে নাই, এখন ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, 'লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি। মনে পড়েছে—এই ছোঁড়াই ফ্যানির পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ফ্যানি কে ?'

'আমাদের বাগানের পাঁচিলের ওপারে একজন ফৌজী সাহেব থাকে দেখনি ? ফ্যানি তারই মেয়ে। এর সঙ্গে তার—'

'তা এখানে কেন ? ফ্যানির কাছে গেলেই তো পারে।'

ফ্যানির কাছে কেন যাইতেছে না এই সমস্যা লইয়া কিছুক্ষণ তিক্ত মনে গবেষণা করিলাম।—ফ্যানি সম্ভবতঃ উহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ঠিকই করিয়াছে—

বিন্দু নিচের দিকে একবার উঁকি মারিয়া হতাশ স্বরে বলিল, 'বাবা ওপর দিকে চেয়ে আছেন; এবার নেমে যেতে হবে, নয়তো সন্দেহ করবেন—'

বিন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'বিন্দু ··'

'আঃ—ও কি করছ! এখনি দেখতে পাবে লোকটা।'

মরিয়া হইয়া বলিলাম, 'দেখুক গে। কোথাকার একটা বেআক্কেলে সাহেব রয়েছে বলে আমরা প্রাণ খুলে কথা কইতে পাব না! রইল তো বয়েই গেল। আমাদের কথা তো আর বুঝতে পারবে না।'

'না না—আজ না—সব মাটি হয়ে গেল! আমি যাই।' বিন্দু ছলছলে চোখে তাহার আশাহত হৃদয়টিকে আমার দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

'মুখপোড়া ড্যাক্‌রা!'—সাহেবটার দিকে বারি-বিদ্যুৎ-ভরা একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিন্দু নামিয়া গেল। আমি বজ্রগর্ভ অন্তর লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ক্রমে দেখিতে পাইলাম, বহুদূর নিম্নে বিন্দু ও তাহার পিতাকে লইয়া মোটর চলিয়া গেল। তখন আমিও শেষবার সাহেবকে রোষকটাক্ষে ভস্মীভূত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নামিবার উপক্রম করিলাম। সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত গিয়াছি—

'মশায় শুনুন।'

পশ্চাতে শূলবিদ্ধবৎ ফিরিলাম।

সাহেব হাতজোড় করিয়া সলজ্জ স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছে; পরিষ্কার বাংলায় বলিল, 'আমাকে মাপ করতে হবে।'

কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া বলিলাম, 'কী ভয়ানক! অর্থাৎ—আপনি বাংলা বলছেন যে! মানে—তবে কী আপনি ইংরেজ নয়?' বিন্দুর

সহিত সাহেব সম্বন্ধে কি কি কথা হইয়াছিল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

সাহেব বলিল, 'ইংরেজ বটে, কিন্তু বাংলা জানি।—পাঁচ বছর বয়স থেকে শান্তিনিকেতনে পড়েছি।···কিন্তু সে যাক। আপনারা নিশ্চয় ভেবেছেন আমি একটা অসভ্য বর্বর, কিন্তু মাইরি বলছি—আমার চলে যাবার উপায় ছিল না।' বলিয়া সাহেব সলজ্জে মাথা নিচু করিল।

বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'ব্যাপার কি ?'

'আমিও—' সাহেব হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল,—'আপনার উনি—অর্থাৎ যে মহিলাটি এসেছিলেন তিনি ঠিক ধরেছেন—ফ্যানির সঙ্গে আমার—'

'এইখানে দেখা করবার কথা ছিল ?'

'হ্যাঁ।—আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।'

ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি ফ্যানি বেদান্ত এবং হবিষ্যান্নের ভক্ত কি না। কিন্তু বলিলাম, 'আপনাদের এত দূরে আসার কি দরকার ? বাড়িতেই তো—'

ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িয়া সাহেব বলিল, 'আপনি ফ্যানির বাবাকে জানেন না—একটি আস্ত কাট-গোঁয়ার। একেবারে পাকা সাহেব। তাঁর বিশ্বাস আমি একেবারে নেটিভ্ হিন্দু হয়ে গেছি, ফ্যানিকে আমার সঙ্গে মিশতে দিতে চান না। তাই আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে—'

মহানন্দে সাহেবের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, 'বন্ধু, এসো শেক্‌হাণ্ড করি। আর যদি দেশী মতে কোলাকুলি করতে চাও, তাতেও আপত্তি নেই।'

কোলাকুলি শেষ হইলে সাহেব বলিল, 'কেন যে ফ্যানি এলো না—হয়তো বুড়োটা···।'

এমন সময় সিঁড়িতে দ্রুত লঘু জুতার খুটখুট শব্দ! পরক্ষণেই একটি তরুণী ইংরেজ মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া প্রায় সাহেবের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, 'ও জিমি, অ্যাম্ আই ভেরি লেট্? বাট্ ড্যাডি—ওঃ!'

আমাকে দেখিয়া মেয়েটির মুখের হাসি নিবিয়া গেল; জিমির বুকের নিকট হইতে ইঞ্চিখানেক সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিল, 'হোয়াট্স্ হি ডুয়িং হিয়ার?'

জিমি অপ্রস্তুতভাবে আমার পানে চাহিয়া হাসিল। আমি বলিলাম, 'জিমি, চললুম ভাই, আর থাকছি না—তোমাদের মিলন মধুময় হোক্।'

কুতুবশীর্ষ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া গেলাম।

কুলপ্রদীপ

ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ মণিকারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে কলকাতার প্রসিদ্ধ কাঞ্চন ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলের বিয়ে। মণিকাঞ্চন সংযোগ।

জ্যোতিষী বলেন,—'রাজ যোটক। এর ফলে যে সন্তান জন্মাবে সে হবে কুলপ্রদীপ।"

কুলপ্রদীপ পৌত্রের আশায় কাঞ্চন ব্যবসায়ী হারাধনবাবু হর্ষান্বিত; তাঁর কুমিরের মত মুখে হাসি এবং দাঁতের যেন অন্ত নেই।

মেয়েটির নাম ছবি। ভাল নামও আছে, কিন্তু সে-নামে দরকার নেই। ইয়মধিক মনোজ্ঞ। ছবি বেশী কথা কয় না, সব কথাতেই হাসে। এমন কি যখন চোখে জল তখনও হাসে। ষোলটি শরতের সোনালী কমল তার সর্বাঙ্গে। যেন একটি পাকা রসে ফেটে-পড়া ডালিম।

ছেলের নাম ভোম্বল। পোশাকী নামও আছে—গজেন্দ্র। কোন্ নাম্‌টি বেশী উপযোগী বোঝা যায় না। তরমুজের মত মুখের ওপর পাঁড় শসার মত একটি নাক। গ্রীবা নেই! রঙীন পাঞ্জাবি পরা দেহটি ফানুসের মত। মেদ-সুকোমল। ভয় হয় টুস্‌কি দিলেই ফেঁসে যাবে, আর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে একরাশ ধোঁয়া—

ভোম্বল শীতকালেও গরম জামা পরে না—শুধু ঢিলে হাতের পাঞ্জাবি। বন্ধুরা বলে, ভোম্বল যোগী, তাই তার শীত করে না। শত্রুরা বলে—ভোম্বলেরও শত্রু আছে—হবে না কেন? ভগবান ওকে দেড় ইঞ্চি পুরু ওভারকোট পরিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—ওর গরম জামার দরকার কি? শুনে ভোম্বল বোকার মত হাসে, তার গলা থেকে নিতম্ব পর্যন্ত চর্বির ওভার কোট নেচে নেচে উঠ্‌তে থাকে।

বিয়ের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় চারিচক্ষের মিলন হয়। ভোম্বল একগাল হাসে; মনে হয় যেন তরমুজে টাঁকি পড়ল। ভেতর থেকে লাল লাল শাঁস আর কালো কালো বিচি দেখা যায়।

ছবিও হেসে ফ্যালে, বরের চেহারা দেখে। তারপরই চোখ ছলছল করে ওঠে। কান্নাহাসি এক সঙ্গে—রোদ আর বৃষ্টি।

যেন শ্যাল-কুকুরের বিয়ে।

২

এক বছর কেটে যায়। তারপর আরও ছ'মাস। ছবি শ্বশুর-ঘর করে। 'বদ্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া অ্যাসিড্ পটাশ্ মোনছাল।' ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু সুখ? যৌবনের সুখ? শতদলের মত তার নবযৌবন মর্মের কোষ মেলে থাকে; পরাগ উড়ে যায়, রস ঝরে পড়ে। কিন্তু ভোমরা কৈ? তার বদলে কোলা ব্যাং—ড্যাব্‌ডেবে চোখ, পেট মোটা

কোলা ব্যাং। ছবি শুধু হাসে—মেঘে ঘেরা তৃতীয়ার চন্দ্রকলার মত, ফ্যাকাসে হাসি—তৃষাতুর।

কুলপ্রদীপের দেখা নেই; ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নাল পর্যন্ত না।

হারাধনবাবু বিপত্নীক; বাড়ি দূরসম্পর্কীয়া কুটুম্বিণীতে ভরা। তারা হা হুতাশ করে—ছেলে হ'ল না, রাজ ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে!

হারাধনবাবুর মুখভরা দাঁত ধারালো এবং হিংস্র হয়ে ওঠে। ভোম্বল বোকাটে হাসি হাসে, মেদ তরঙ্গিত দুল্‌কি হাসি।

বৌ বাঁজা। নইলে কুলপ্রদীপের আসতে এত বিলম্ব হয় কেন?

ঘটা করে বধূর চিকিৎসা আরম্ভ হয়। প্রথমে কবিরাজী। কবিরাজ ওষুধের ব্যবস্থা করেন। এমন তেজালো ওষুধ যে ঘটিবাটিতে পড়লে ঘটি-বাটির গর্ভসঞ্চার হয়। ছবি এই তেজালো ওষুধ খায়। বুক পেট মুখ জ্বলে যায়, তবু খেতে হয়। অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসে, তবু খেতে হয়। এই রকম ছ'মাস। ছবির চোখে জল মুখে হাসি। মনে জানে ওষুধ নিষ্প্রয়োজন, তবু ওষুধ খায়।

কিন্তু কুলপ্রদীপের দেখা নেই। ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নাল পর্যন্ত না। কবিরাজী তেজালো ওষুধের নির্বীর্যতা প্রমাণ হয়ে যায়।

ডাক্তার আসেন—অ্যালোপাথ। ছবিকে পরীক্ষা করে বলেন—বন্ধ্যা নয়, তবে জরায়ুর দোষ। ও কিছু নয়। কুলপ্রদীপের আগমন আমি সুগম করে দিচ্ছি।

ইন্‌জেকশন।

ছ'মাস ধরে ইন্‌জেকশন চল্‌তে থাকে। ছবির সারা গা ঝাঁজ্‌রা শতচ্ছিদ্র হয়ে যায়। বসতে পারে না—শুতে পারে না; সর্বাঙ্গে ব্যথা। আর মনে? সে কথা বলে আর লাভ কি? তবু সে হাসে। কিন্তু সে-হাসি নিংড়োলে ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়ে। বুকের তাজা রক্ত।

এমনি করে বছর ঘুরে যায়।

চোখের কোলে কালি, ছবি ক্রমে শীর্ণ হতে থাকে। যেন গ্রীষ্মের ঝর্ণা, যেন তাপসী অপর্ণা। ক্রমে শয্যা আশ্রয় করে।

ছবির বাবা কৈলাসবাবু দেখতে আসেন। মেয়ে দেখে কেঁদে ফ্যালেন। মা-হারা মেয়ে, একটিমাত্র সন্তান। এই তাব দশা!

ছবিকে তিনি বাড়ি নিয়ে যান। যাবার সময় হারাধনবাবু নোটিস্ দিয়ে দেন—আর একবছর তিনি দেখবেন, তার পরই আবার ছেলের বিয়ে। কুলপ্রদীপ তাঁর চাই-ই।

তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ভোম্বল ন্যাকা-ন্যাকা বোকা-বোকা হাসে। পাড়ায় এই নিয়ে আলোচনা হয়। বন্ধুরা বলে, ভোম্বল যোগী—জিতেন্দ্রিয়—। শত্রুবা যা বলে তা শোনা যায় না, কারণ শোনবার আগেই কানে আঙুল দিতে হয়।

৩

ছবি বাপের বাড়ি এসে প্রাণখুলে হাসে। বাড়িতে বাপ ছাড়া আর কেউ নেই, কেবল ঝি চাকর। তবু এ বাড়িতে মন লাগে। এ বাড়িতে কুমির নেই, কোলা ব্যাং নেই; অনাগত কুলপ্রদীপের বিপুলায়তন কালো ছায়া নেই। ছবি আগেকার মত বাড়িময় হেসে খেলে ছুটোছুটি করে বেড়াতে চায়। কিন্তু শরীর দুর্বল—পারে না।

কৈলাসের মনে হারাধনের বিদায়কালীন নোটিস জেগে ওঠে। তিনি ডাক্তার ডাকেন।

পাড়ায় একজন নবীন ডাক্তার এসেছেন। বিলিতি পাস—এম্ আর সি পি। বয়স বত্রিশ-ভিজিটও তাই। কৈলাস তাঁকেই ডাকেন। মেয়ের রোগের ইতিহাস বলেন। বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলেন।

ডাক্তার মন দিয়ে শোনেন, তারপর রোগিনীর ঘরে যান। সুন্দর চেহারা, bedside manners অতুলনীয়। ডাক্তার ছবিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেন। কৈলাস ব্যাকুল নেত্রে চেয়ে থাকেন। ডাক্তার ছবিকে প্রশ্ন করেন। ছবি মুখ টিপে হাসে, তারপর চোখ বুজে উত্তর দেয়।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। কৈলাসের মুখে দিকে চেয়ে বলতে চান—আপনার মেয়ের কোনও রোগ নেই, রোগ অন্যত্র। কিন্তু বলতে গিয়ে মুখে কথা বেধে যায়, করুণায় বুক ভরে ওঠে। একটু ভেবে বলেন,—একমাস সময় পেলে আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু রোজ রোগিনীকে দেখা চাই।

ডাক্তার চেষ্টা করবেন এই আহ্লাদে কৈলাস কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়েন।

পরদিন থেকে নিয়মিত ডাক্তারের যাতায়াত আরম্ভ হয়। ডাক্তারের আসার সময়ের ঠিক নেই। কোনও দিন সকালে, কোনও দিন বিকেলে, আবার কখনও বা দুপুরে। কৈলাস কখনও উপস্থিত থাকেন, কখনও থাকতে পারেন না। ডাক্তারের ওপর অগাধ বিশ্বাস—বিলিতি ডাক্তার!

ডাক্তারের নাম শৈলেন। অল্পদিনেব মধ্যে খুব পসার করে ফেলেছে। নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। দুপুর বেলা যে ফুরসতটুকু পায় সেই সময়ে ছবিকে দেখতে আসে।

ছবির ঘরে গিয়ে শৈলেন জিগ্যেস করে,—আজ কেমন আছো?

ছবি হাসে, ঘাড় বাঁকায়, মুখ টিপে বলে, ভাল আছি।

শৈলেন ছবির নাড়ী টিপতে বসে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট—চোখ বুজে নাড়ী দেখে। ছবি ডাক্তারের মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসে। তার বুকের মধ্যে একরাশ নিশ্বাস জমা হয়ে ওঠে, তারপর সশব্দে বেরিয়ে আসে।

শৈলেন চমকে উঠে বলে—ভয় নেই, শিগ্‌গির সেরে উঠবে।

ডাক্তারে রোগিনীতে চোখাচোখি হয়, তারপর দু'জনেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। দু'জনেই জানে রোগ কী এবং কোথায়।

দু' হপ্তা কেটে যায়।

ছবির গালে ডালিম ফুল আবার ফুটে ওঠে। পাতাঝরা লতার মত শীর্ণ দেহ আবার নবপল্লবিত হয়। সারাদিন একলা বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। গুনগুন করে গান করে। সখি রে, কি পুছসি অনুভব মোয়।

ডাক্তার এলে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ডাক্তার জিগ্যেস করে, —আজ কেমন আছো ?

ছবি হাসে, ঘাড় বাঁকায়, বলে—সেরে গেছি। ও ওষুধ আর খাবনা। বড্ড মিষ্টি, গলা কিট্‌কিট্‌ করে—

ডাক্তার ছবির হাত ধরে জানলার কাছে নিয়ে যায়; চোখের পাতা টেনে শরীরে রক্তের পরিমান নির্ণয় করে। বলে—আচ্ছা, অন্য ওষুধ দেব। টক্‌-টক্‌ মিষ্টি-মিষ্টি, খুব ভাল লাগবে।

তারপর একথা সেকথা হয়। ছবি হাসে, সহজ ভাবে গল্প করে। শৈলেনের বুকে ছবির হাসি ল্যান্‌সেটের মত বিঁধতে থাকে।

কৈলাসের সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হলে কৈলাস জিগ্যেস করেন—এখন কেমন দেখছেন ?

শৈলেন বলে—ভাল।

কৈলাস নিজের চোখেই তা দেখতে পান; গলদশ্রু হয়ে পড়েন। বলেন,—সে রোগটা সারবে তো ?

শৈলেন বলে -আশা করি।

আরও এক হপ্তা কাটে। ডাক্তার নিয়মিত আসে, একদিনও কামাই যায়না। ছবির রূপ হয়েছে আগের মত—একটি পাকা রসে-ফেটে-পড়া ডালিম।

শৈলেন প্রায়ই স্টেথস্কোপ আনতে ভুলে যায়। বাধ্য হয়ে, ছবিকে বিছানায় শুইয়ে তার বুকে মাথা রেখে, হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা নিরূপণ করতে হয়। হৃদযন্ত্রের মধ্যে তোলপাড় শব্দ শুনে ডাক্তারের ললাট চিন্তাক্রান্ত হয়। জিগ্যেস করে—বুক ধড়্‌ফড়্ করছে? ছবি উত্তর দেয় না, চোখ বুজে শুয়ে থাকে। একটু হাসে।

প্রায় রোজ এই রকম হয়।

কোনও কোনও দিন অজ্ঞাতে ছবির একখানা হাত ডাক্তারের মাথার ওপর পড়ে, চুলের ভেতর আঙুলগুলো অজ্ঞাতে খেলা করে, আবার অজ্ঞাতে সরে যায়। ডাক্তার রোগিনীর বুকের মধ্যে দুম্‌দুম্ শব্দ শুনতে পায়—যেন দুন্দুভি বাজছে। দশ মিনিটের কমে বুকের ওপর থেকে মাথা তুলতে পারেন না।

বেশী কথা হয় না। কথার দরকার হয় না, চারটে চোখ যেখানে এত বাচাল, সেখানে রসনা নীরব হয়েই থাকে।

ডাক্তার বলে—যখন একেবারে সেরে যাবে, আমি আর আসব না—তখন কি করবে?

ছবি হাসে, বলে—শ্বশুরবাড়ি যাব। চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল পড়ে।

৪

একমাস ফুরিয়ে আসে—আর চার দিন বাকি।

ভোম্বল শ্বশুর বাড়ি আসে। ছবির চেহারা দেখে তার সারা গায়ে আহ্লাদের ভূমিকম্প জেগে ওঠে—আলিপুরের সাইস্‌মোগ্রাফে সে কম্পন ধরা পড়ে।

ছবিও হেসে লুটিয়ে পড়ে। তার মনে উদয় হয় দুটো চিত্র—তার স্বামীর আর শৈলেন ডাক্তারের—পাশাপাশি।

ভোম্বল বলে—বাবা বললেন তাই নিতে এসেছি। হে হে—

ছবি বলে—আজ নয়, পরশু এসে নিয়ে যেও।

ভোম্বল ফিরে যায়। যাবার সময় ছবির দিকে তাকিয়ে কোল টেনে হাসে—হে হে—

দুপুর বেলা ডাক্তার আসে।

ছবি বলে—পরশু শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।

তার মুখে বাণবিদ্ধ হাসি—Crucified.

ডাক্তারের আত্মসংযম হারিয়ে যায়। বলে—ছবি!

দুপুর বেলার অলস বাতাসে ঘরের দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। দরজায় ইয়েল্ লক্ লাগানো কড়াত করে শব্দ হয়—

দুপুর বেলার অলস বাতাস প্রকৃতির কোন্ ইঙ্গিত বহন করে বেড়ায়?

৫

ছবি শ্বশুর বাড়ি যায়। টকটকে লাল রেশমী শাড়ি পরা—যেন বিয়ের কনে। অনাস্বাদিত মধু—অনাবিদ্ধ রত্ন।

গাড়ি বারান্দায় মোটর দাঁড়িয়ে—তার মধ্যে ভোম্বল। গাড়ির একদিকের স্প্রিং একেবারে দমে গেছে।

কৈলাস আর ডাক্তার শৈলেন পাশাপাশি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কৈলাসের চোখ ছলছল; শৈলেনের মুখ পাথরে কোঁদা—নিশ্চল।

ছবি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে গিয়ে ওঠে। তারপর বাড়ির

দিকে ফিরে তাকায়। হয়তো বাপের দিকেই তাকায়। তার মুখে বাণবিদ্ধ হাসি—Crucified.

মোটর চলে যায়।

৬

তিন মাস কাটে।

হারাধনবাবুর মুখ-গহ্বরের অন্ধকার বারম্বার দংষ্ট্রামযুখে খণ্ড বিখণ্ড হতে থাকে। ভোম্বল মেদতরঙ্গিত তুল্‌কি হাসি হাসে।

কুলপ্রদীপের ডিস্‌টাট সিগ্‌নাল পড়েছে।

বন্ধুরা আর কিছু বলে না, কেবল ভোম্বলকে অনুরোধ করে—খাওয়াও!

শত্রুরা যা বলে তা শোনা যায় না, কারণ শোনবার আগেই কানে আঙুল দিতে হয়।

গ্যাঁড়া

আজ রাত্রে আমার কন্যার বিবাহ।

সকালবেলা দার্শনিক মনোভাব লইয়া বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছি। একটা নূতন সম্বন্ধের সূত্রপাত হইতে চলিয়াছে। মানুষের জীবনে নূতন নূতন সম্পর্কের বন্ধন ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিতে থাকে!...

বাড়ি আত্মীয়-কুটুম্বে ভরিয়া গিয়াছে। অসংখ্য ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পিপীলিকার মতো চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; কলহ

করিতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, আছাড় খাইতেছে। ইহাদের সকলকে ভালো করিয়া চিনি না।

আকাশে কাক-চিল আমার বাড়িটাকেই লক্ষ্য করিয়া চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে; কারণ তেতলার ছাদে রান্নার আয়োজন ও ভিয়ান বসিয়াছে। কলিকাতায় কাক-চিলের সংখ্যা বড় কম নয়।

সকলের সহিত তাল রাখিয়া উঠানের এক কোণে শানাই বাজিতেছে। বাড়ি সরগরম।

এখনও দু' একজন আত্মীয়-বন্ধু আসিয়া পৌছিতে বাকি আছে। ভাগলপুর হইতে ছোট শ্যালকের আসিবার কথা—

বাড়ির সম্মুখে গাড়ি আসিয়া থামিল; ছোট শ্যালক গাড়ি হইতে নামিল। সঙ্গে একটি অপরিচিত যুবক; আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা, পায়ে বার্নিশ পাম্প্-স্থ, হাতে সোনার রিস্ট্ ওয়াচ্—বেশ ভব্যিযুক্ত মানুষ।

শ্যালককে সম্ভাষণ করিলাম, 'এসো হে সমর—'

সমর আসিয়া আমাকে একটা প্রণাম ঠুকিল। অত্যন্ত চট্‌পটে কর্মপটু আমার এই শ্যালকটি! একদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সর্বদাই ব্যস্ত।

প্রণাম করিতে করিতেই বলিল, 'এসে পড়লাম। আবার কালই ফিরতে হবে। গ্যাঁড়াকেও নিয়ে এলাম।...গ্যাঁড়া, তুমি ব'সো, আমি চট্ করে দিদির সঙ্গে দেখা করে আসি।'

সঙ্গীকে আমার কাছে বসাইয়া সমর বাড়ির ভিতর অন্তর্হিত হইল। বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। এই ভদ্র যুবকটির নাম গ্যাঁড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ভালো নাম একটা আছে, কিন্তু আমি তাহা

জানি না। ইনি সমরের বন্ধু, সম্ভবতঃ ধনী। ইঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব ?

যা হোক, শ্যালকের বন্ধু, আমার কন্যার বিবাহে আসিয়াছেন, আপ্যায়িত করিতে হইবে। বলিলাম, 'বড় খুশি হলাম, হেঁ হেঁ—ভাগলপুরেই থাকা হয় বুঝি।'

'আজ্ঞে, বাঙালীটোলায়।'

গ্যাঁড়ার গলার আওয়াজ ঘষা-ঘষা, যেন ধোঁয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাহার কথার ভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটা তেজস্বিতা আছে। অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল। যুবককে ঠিক কিভাবে গ্রহণ করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। সমকক্ষের মতো ব্যবহার করিব, না সম্মানিত ব্যক্তির মতো ? অথবা স্নেহভাজন কনিষ্ঠের মতো ? আপনি না তুমি ? অবশ্য আমি তাহার চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু কেবলমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠতার জোরে কাহাকেও 'তুমি' বলা নিরাপদ নয়। তাহার পায়ের পাম্প্ ও হাতের রিস্ট্ ওয়াচ বেশ দামী বলিয়াই মনে হইতেছে।

গ্যাঁড়া ! নামটা এমন বেয়াড়া যে উহাকে মোলায়েম করিয়া আনাও এক রকম অসম্ভব। অথচ গ্যাঁড়া বলিতেও বাধিতেছে। মনে মনে কয়েকবার 'গেঁড়ুবাবু', 'গেঁড়ুবাবু' উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু খুব শ্রুতিমধুর মনে হইল না।

যুবক নাসিকার প্রান্তভাগ কয়েকবার কুঞ্চিত করিয়া হঠাৎ বলিল, 'ঘি পুড়ছে—ঘি পুড়ছে—' কণ্ঠস্বরে একটু অসন্তোষ প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, 'ছাদে ভিয়েন বসেছে কিনা। আপনার নাক তো খুব তীক্ষ্ণ, গেঁড়ুবাবু...'

'গ্যাঁড়া—গ্যাঁড়া। বাবু-টাবু নয়। আমাকে সবাই গ্যাঁড়া বলে ডাকে।'

বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলাম। কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত কি ভদ্রলোককে গ্যাঁড়া বলিয়াই ডাকিতে হইবে? কিন্তু মনের ভিতর সায় পাইতেছি না যে!

সমস্যা যখন এইরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সমর ফিরিয়া আসিল—

'নাও নাও, গ্যাঁড়া, আর দেরি কোরো না—কাজ আরম্ভ করে দাও। তেতলার ছাদে ভিয়েন বসেছে, তুমি সটান সেখানে চলে যাও। দিদি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

গ্যাঁড়া চক্ষের নিমেষে পাঞ্জাবি, পাম্প্ ও রিস্ট্ ওয়াচ্ খুলিয়া তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইল। সমর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'খাজা তৈরি করবার জন্যে গ্যাঁড়াকে নিয়ে এসেছি। ও হ'ল ভাগলপুরের সেরা কারিগর।'

মুহূর্ত মধ্যে গ্যাঁড়ার সহিত আমার সম্পর্ক সহজ ও সরল হইয়া গেল; তাহাকে গ্যাঁড়া এবং তুমি বলিতে মনের মধ্যে আর কোনও দ্বিধা রহিল না।

হাসিয়া বলিলাম, 'বেশ, বেশ, তাহ'লে আর দেরি নয়, গ্যাঁড়া, তুমি কাজে লেগে যাও। বিকেল থেকেই বড় বড় অতিথিরা আসতে আরম্ভ করবেন—চিংড়িদহের কুমার বাহাদুর, স্যার ফজলু—দেখো, যেন ভাগলপুরের নিন্দে না হয়।'

ঝি

বংশে সাত পুরুষে কেহ চাকরি করে নাই ; তাই প্রথম চাকরি পাইয়া ভয় হইয়াছিল, না জানি কত লাঞ্ছনা গঞ্জনাই ভাগ্যে আছে।

মার্চেণ্ট আপিসে কেরানির চাকরি। যাঁহার চেষ্টায় ও সুপারিশে চাকরি পাইয়াছিলাম, তিনি অফিসের বড়বাবু, আমার পিতৃবন্ধু—নাম গণপতি সরকার। ভেল্‌কি-টেল্‌কি দেখাইতে পারিতেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় সহজেই চাকরি জুটিয়াছিল। এমন কি আমাকে কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা-সাক্ষাৎও করিতে হয় নাই।

গণপতিবাবুর চেহাবাটি ছিল তাঁহার পাকানো উড়ানি চাদরের মতোই ধোপদুরস্ত এবং শীর্ণ নমনীয়তায় বঙ্কিম ; তাঁহাকে নিংড়াইলে এক বিন্দু রস বাহির হইবে এমন সন্দেহ কাহারও হইত না। ক্রমশঃ জানিতে পারিয়াছিলাম, তিনি বিলক্ষণ রসিক লোক, কিন্তু তাঁহার সরসতা ছিঁচকে চোরের মতো এমন অলক্ষ্যে যাতায়াত করিত যে সহসা ধরা পড়িত না।

তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলিবার পর তিনি মাঝে মাঝে মুখের বামভাগে একপ্রকার ভঙ্গী করিতেন ; তাহাতে তাঁহার অধরোষ্ঠের প্রান্ত হইতে চোখের কোন পর্যন্ত গালের উপর একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি খাঁজ পড়িয়া যাইত। এই ভঙ্গীটাকে হাসিও বলা যায় না, মুখ-বিকৃতি বলিলেও ঠিক হয় না—

যেদিন প্রথম আপিস করিতে গেলাম, গণপতিবাবু আমার সাজ-পোশাক পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আর সব ঠিক আছে, কিন্তু লপেটা চলবে না ; কাল থেকে শু পরে আসবে। চলো, তোমাকে বড় সাহেবের

সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি। সাহেবের সামনে বেশি কথা কইবে না; তিনি যদি রসিকতা করেন, বিনীতভাবে মুচকি মুচকি হাসবে।'

বলিয়া তিনি গালের ভঙ্গী করিলেন।

বেশ ভয়ে ভয়েই সাহেবের সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া কিন্তু একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। সাহেব মোটেই নয়—ঘোরতর কালা আদমি। চণ্ডীর মহিষাসুরকে জলজ্যান্ত নরমূর্তিতে কল্পনা করিলে ইহার চেহারাখানা অনেকটা আন্দাজ করা যায়; বেঁটে, মোটা, গজস্কন্ধ, চক্ষু দু'টি কুঁচের মতো লাল, তাহার উপর বিলাতী পোশাক পরিয়া অপূর্ব খোলতাই হইয়াছে! বয়স অনুমান করা কঠিন, তবে চল্লিশের নিচেই। প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে বসিয়া এক মুখ পান চিবাইতেছেন এবং দেশলায়ের কাঠি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছেন।

পরে জানিতে পারিয়াছিলাম মিস্টার ঘনশ্যাম ঘোষ একজন অতি তুখড় ও কর্মনিপুণ ব্যবসায়ী, বছরে বার দুই বিলাত যান; সেখানে কোম্পানির বিলাতী কর্তৃপক্ষ তাঁহার কথায় উঠে বসে। বস্তুতঃ, বিলাতী সওদাগরী আপিসে একজন বাঙ্গালীর এমন অখণ্ড প্রতাপ আর কখনও দেখা যায় নাই।

আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই এমন ব্যবহার করিলেন যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভয় তো দূর হইলই, ইনি যে একজন অত্যন্ত কদাকার ব্যক্তি একথাও আর মনে রহিল না! কথার অমায়িকতায় মুহূর্ত মধ্যে আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন।

'এই যে বড়বাবু, এটি বুঝি আপনার নতুন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট? বেশ বেশ।···দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে?—ব'সো। · বড়বাবু, আপনি আপনার কাজে যান না···বিয়ে করেছ? বেশ বেশ, আরে, তোমাদেরই তো বয়েস। এখন চাকরি হ'ল, আর কি! মন মানিয়ে কাজ করবে—

ব্যস, দেখতে দেখতে উন্নতি ; আমার আপিসে কাজের লোক পড়ে থাকে না···নাও, পান খাও···আরে, লজ্জা কিসের ? তোমরা হ'লে ইয়ং ব্লাড্, নতুন বিয়ে করেছ, পান খাও তা কি আর আমি জানি না ? আমার আপিসে ডিসিপ্লিনের অত কড়াকড়ি নেই··নাও নাও— হে-হে হে···'

তারপর সুখস্বপ্নের মতো দিনগুলি কাটিতে লাগিল। চাকরি যে এত মধুর তাহা কোনদিন কল্পনা করি নাই। কাজকর্ম এমন কিছু নয়, একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক দু'ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দিনের কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে পারে। তারপর অখণ্ড অবসর, সমবয়স্ক সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজব, বারান্দায় গিয়া সিগারেট টানা। কর্তা প্রায়ই ডাকিয়া পাঠান, তাঁহার সামনে চেয়ারে গিয়া বসি, তিনি পান দেন, খাই ; কখনও বাড়ি হইতে ভালো পান সাজাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে দিই। তিনি খুশি হইয়া খুব রঙ্গতামাশা করেন ; কখনও বা রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার হাসি-তামাশা একটু আদিরস-ঘেঁষা হইলেও ভারি উপাদেয়। বস্তুতঃ, তিনি যে অত্যন্ত নিরহংকার অমায়িক প্রকৃতির মানুষ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই রহিল না।

গণপতিবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেন, 'ওহে বাবাজী, একটু সামলে চ'লো। কর্তা তোমাকে ভালো নজরে দেখেছেন খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু যতটা রয়-সয় ততটাই ভালো। আস্কারা পেয়ে যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলো না—নিজের পোজিশন বুঝে চ'লো। কর্তা লোক খারাপ নয়, কিন্তু কথায় বলে—বড়র পিরিতি বালির বাঁধ···'

লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি কর্তার সহিত প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ একেবারে খাঁটি রাখিয়াছিলেন। কর্তা তাঁহার সহিত হাস্য-পরিহাস করিতেন,

কিন্তু তিনি বিনীতভাবে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি ছাড়া আর কোন উত্তরই দিতেন না।

মাস তিনেক কাটিবার পর একদিন দুপুরবেলা অবকাশের সময় কর্তার ঘরে গিয়াছিলাম ; ঘরে পা দিয়াই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিলাম। কর্তা নিজের চেয়াবে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়াছিলেন, আমার সাড়া পাইয়া চোখ তুলিলেন। তাঁহার চোখ দেখিয়া থমকিয়া গেলাম। জবা-ফুলের মতো লাল চোখে আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'কি চাও ? এ ঘরে তোমার কি দরকার ?'

তাঁহার এ-রকম কণ্ঠস্বর কখনও শুনি নাই, থতমত খাইয়া গেলাম, 'আজ্ঞে—আমি ··'

তিনি লাফাইয়া উঠিয়া গর্জন করিলেন, 'পান চিবুতে চিবুতে পাঞ্জাবি উড়িয়ে আপিস করতে এসেছ ছোকরা ? এটা তোমার শ্বশুর বাড়ি পেয়েছ বটে ! গায়ে ফুঁ দিয়ে ইয়ার্কি মেরে বেড়াবার জন্যে আমি তোমাকে মাইনে দিই ? যাও টুলে বসে কাজ করোগে। তোমার মতো পুঁচকে কেরানি খবর না দিয়ে আমার ঘরে ঢোকে কোন্ সাহসে ? ফের যদি এরকম বেচাল দেখি দূর করে দেব···'

হোঁচট খাইতে খাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এ কি হইল ?

নিঃসাড়ে নিজের জায়গায় গিয়া বসিলাম। অভিভূতের মতো আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

আমি নূতন লোক, তাই বড়বাবুর পাশেই আমার আসন। চোখ তুলিয়া দেখিলাম তিনি গভীর মনঃসংযোগে খস্‌খস্ করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন, আর সকলে নিজ নিজ কাজে মগ্ন, কেহ মাথা তুলিতেছে

না। আমি কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'কি হয়েছে, কাকাবাবু?'

তিনি লেখা হইতে চোখ না তুলিয়াই চাপা গলায় বলিলেন, 'কাজ করো—কাজ করো···'

সেদিন সন্ধ্যার পর গণপতিবাবুর বাসায় গেলাম। তক্তাপোশের উপর বসিয়া তিনি তামাক খাইতেছিলেন, সদয়কণ্ঠে বলিলেন, 'এসো বাবাজী।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; লজ্জায় ধিক্কারে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। শেষে অতি কষ্টে বলিলাম, 'কি হয়েছে আমায় বলুন। আমার কি কোন দোষ হয়েছে?'

তিনি বলিলেন, 'না—তোমার আর দোষ কি? তবে বলেছিলুম, 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ···'

'এর মধ্যে কোনও কথা আছে। আপনি আমাকে সব খুলে বলুন, কাকাবাবু।'

তিনি কিছুক্ষণ একমনে ধূমপান করিলেন।

'খুলে বলবার মতো কথা নয়, বাবাজী।'

'না, আপনাকে বলতে হবে। কেন উনি আজ আমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করলেন?'

তিনি দীর্ঘকাল নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেবল তাঁহার গালে মাঝে মাঝে খাঁজ পড়িতে লাগিল।

'বলুন, কাকাবাবু।'

'তুমি ছেলের মতন, তোমায় কাছে বলতে সংকোচ হয়। আসল কথা—ঝি।' বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন; তাঁহার গালে একটা বড় রকমের খাঁজ পড়িল।

কিন্তু—ঝি! কথাটা ঠিক শুনিয়াছি কিনা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বললেন—ঝি?'

গণপতিবাবু উর্ধ্বদিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, ক'দিন থেকে বড় সাহেবের মন ভালো যাচ্ছে না···আয়া জানো—আয়া? যে-সব ঝি সাহেবদের ছেলে মানুষ করে? আমাদের বড় সাহেবের ছেলের আয়া হপ্তাখানেক হ'ল চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

মাথা গুলাইয়া গেল; গণপতিবাবু এ সব আবোলতাবোল কি বলিতেছেন? বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো বলিলাম, 'কিন্তু—কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছি না।'

গণপতিবাবু তখন বুঝাইয়া দিলেন। স্পষ্ট কথায় অবশ্য কিছুই বলিলেন না, কিন্তু ভাবে-ভঙ্গিতে, অর্থপূর্ণ ভ্রূ-বিলাসে, সময়োচিত নীরবতায় এবং গালের বিচিত্র ভঙ্গীদ্বারা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া দিলেন। সংক্ষেপে ব্যাপার এই—আমাদের বড় সাহেব বছর তিনেক আগে বিপত্নীক হন; তাঁহার পত্নী একটি পুত্র প্রসব করিয়া সূতিকাগৃহেই মারা যান। তারপর হইতে শিশুকে লালনপালন কবিবার জন্য ঝি—অর্থাৎ আয়া রাখা হয়। সেই ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ঘনশ্যামবাবু অত্যন্ত যত্নসহকারে ঝি নির্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও কারণে ঝি মনের মতো না হইলে, কিংবা ছাড়িয়া গেলে সাহেবের মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়, এমন কি তাঁহার স্বভাবই একেবারে বদলাইয়া যায়। গত কয়েক মাস একটি ক্রিশ্চান যুবতী কাজ করিতেছিল, কিন্তু সে হঠাৎ বিবাহ করিবার অজুহাতে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; অথচ মনের মতন নূতন ঝি পাওয়া যাইতেছে না। তাই এই অনর্থ।

থ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এও কি সম্ভব! এই কারণে মানুষের

চরিত্রে এমন পরিবর্তন ঘটিতে পারে? কিন্তু গণপতিবাবু তো গুল মারিবার লোক নহেন। তবু এক সংশয় মনে জাগিতে লাগিল।

বলিলাম, 'কিন্তু উনি আবার বিয়ে করেন না কেন?'

এ প্রশ্নের সদুত্তর গণপতিবাবু দিলেন।—ঘনশ্যামবাবুর শ্বশুর অদ্যাপি জীবিত; তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রকাণ্ড জমিদার। তাঁহার সন্তানসন্ততি কেহ জীবিত নাই, এই দৌহিত্রই—অর্থাৎ ঘনশ্যামবাবুর পুত্রই—তাঁর উত্তরাধিকারী। কিন্তু শ্বশুরমহাশয় জানাইয়া দিয়াছেন যে, জামাতা বাবাজী যদি পুনরায় বিবাহ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া এক দূরসম্পর্কের ভাগিনেয়কে সেবায়েত করিবেন।

সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল। তবু একটা গোলচোখো রুদ্ধশ্বাস বিস্ময় মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখিল। এমন সব ব্যাপার যে দুনিয়ায় ঘটিয়া থাকে তাহার অভিজ্ঞতা তখন একেবারেই ছিল না।

তারপর পাঁচ ছয় দিন কাটিল। আপিসে যতক্ষণ থাকি, কাঁটা হইয়া থাকি; কি জানি কখন আবার মাথার উপর হুড়মুড় শব্দে আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে! ইতিমধ্যে দু-তিন জন সহকর্মীর সামান্য ত্রুটির জন্য অশেষ লাঞ্ছনা হইয়া গিয়াছে। চাকরি যে কী বস্তু তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেদিন আপিসে গিয়া সবে মাত্র নিজের আসনে বসিয়াছি, আর্দালি আসিয়া খবর দিল বড় সাহেব তলব করিয়াছেন! প্লীহা চমকাইয়া উঠিল। এই রে, না জানি কোথায় কি ভুল করিয়া বসিয়াছি, আজ আর রক্ষা নাই!

ফাঁসির আসামির মতো কর্তার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তিনি নিজের চেয়ারে বসিয়া হেঁটমুখে দেরাজ হইতে কি একটা বাহির করিতেছিলেন,

মুখ না তুলিয়াই প্রফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে শৈলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে ভালো জর্দা আনিয়েছি—দেখ দেখি খেয়ে; মুক্তো-ভস্ম মেশানো জর্দা হে—বড় গরম জিনিস!—হে হে হে…'

দেড় ঘণ্টা ধরিয়া এই ভাবে চলিল—যেন এ মানুষ সে মানুষ নয়। ইনি যে কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে পারেন তাহা কল্পনা করাও কঠিন। কোথায় সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র দৃষ্টি, কোথায় সে কর্কশ দুঃসহ গলার আওয়াজ! তিনি আবার আমাকে তাঁহার সহৃদয়তার প্রবল প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি মন্দ লোক্ একথা আর কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না।

ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিতে বসিতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিলাম, 'কাকাবাবু, ব্যাপার কি?'

গণপতিবাবুর কলমে একগাছি চুল জড়াইয়া গিয়াছিল, সেটিকে নিব্ হইতে সন্তর্পণে মুক্ত করিয়া তিনি অবিচলিতভাবে আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আমার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই ঘষা গলায় বলিলেন, 'ঝি পাওয়া গেছে।'

বলিয়া গালের ভঙ্গী করিলেন।

টুথ-ব্রাশ্

প্রসঙ্গটি বৈষয়িক। অপিচ মনস্তত্ত্ব যৌনতত্ত্বের সঙ্গেও ইহার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে।

রসশাস্ত্র বিষয়বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। 'সুতরাং মানুষের মৌলিক মূল্য লইয়া দর-কষাকষি রসের হাটে চলিবে কিনা তাহাতে

সন্দেহ আছে 'হিউম্যান্ ভ্যালুস্' কথাটা শুধু বিদেশী নয়, অত্যন্ত অর্বাচীন।

* * *

সুবোধবাবুর মস্তকে একটি অত্যাশ্চর্য টাক ছিল। টাক সাধারণতঃ মস্তকের সম্মুখভাগে বঙ্গোপসাগরের আকারে পড়িয়া থাকে; ইহাই রীতি। সুবোধবাবুকে দেখিয়া কিন্তু কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না যে, তাঁহার টেরি-কাটা মস্তকের সমস্ত পশ্চাদ্ভাগটা উষর নির্লোমতায় একেবারে ধূ ধূ করিতেছে। তাঁহার চরিত্রেও, বোধ করি, এমনই একটা ধোঁকা-লাগানো অ-গতানুগতিক বৈচিত্র্য ছিল, সম্মুখ দেখিয়া সহসা পশ্চাতের খবর পাওয়া যাইত না।

আমার সহিত অল্পদিনের জন্যই আলাপ হইয়াছিল, পশ্চিমের যে শহরে আমি বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তিনি ছিলেন সেই শহরের একজন উন্নতিশীল ব্যবসাদার। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, ধীর প্রিয়ভাষী লোক, অত্যন্ত সাধারণ কথাও বেশ রস দিয়া বলিতে পারিতেন। আলাপের পূর্বে অন্য পাঁচজনের মুখে তাঁহার অখ্যাতি-সুখ্যাতি দুই-ই শুনিয়াছিলাম; তাহা হইতে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ব্যবসা-সম্পর্কে তিনি যেমন নিষ্ঠুর, তৎপূর্বে ও পরে তেমনই অমায়িক।

বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাঁহার সংস্পর্শে আসি নাই বলিয়াই, বোধ হয়, সুবোধবাবুকে আমার ভালো লাগিয়াছিল। কার্পণ্য-দোষ তাঁহার ছিল না; প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়িতে বহু ভদ্রবেশী অভ্যাগতের ভিড় জমিত। সুবোধবাবুর আধুনিকা ও সুচটুলা স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া একটি সামাজিক আসর গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজেও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন; তাঁহার মোলায়েম হাসি-তামাশা এই সান্ধ্য সভার একটা উপভোগ্য উপাদান ছিল।

কেন জানি না, তাঁহাকে এই মজলিসের বায়ুমণ্ডলে রবারের রঙিন বেলুনের মতো নির্লিপ্ত সহজতায় ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিয়া আমার মনে হইত, যেন তিনি মনের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেক কথা ও কার্য ওজন করিতেছেন, তাহার মূল্য ধার্য করিতেছেন। এ বিষয়ে মুখে তিনি কিছুই বলিতেন না, তবু তাঁহার মনের এই তুলাদণ্ডটি সর্বদা সক্রিয় হইয়া আছে, তাহা অনুভব করিয়া আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিতাম।

একদিন তিনি মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি ছড়ি ব্যবহার করেন কেন, বলুন দেখি ?'

যুক্তিসম্মত কোনও উত্তরই ছিল না। বেড়াইতে বাহির হইবার সময় একটা ছড়ি হাতে না থাকিলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ও নিঃসম্বল মনে হয়—এইটুকুই বলিতে পারি।

তাহাই বলিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমার পানে সেই ওজনকরা দৃষ্টি ফিরাইয়া একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার কাছে এই অকারণ ছড়ি বহন করিয়া বেড়ানো যে একান্ত অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।

মনুষ্যচরিত্রের গূঢ় মর্ম উদ্ঘাটন করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা হয়তো সুবোধবাবুব বিচিত্র টাক ও অন্যান্য বাহ্য অভিব্যক্তি হইতে তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন, কিন্তু এক মাসের পরিচয়ের ফলে তিনি আমার কাছে যেন একটু আবছায়া রহিয়া গিয়াছেন। এমন কি, শেষের যে গুরুতর ঘটনাটা এক সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের মতো তাঁহার মাথার উপর ফাটিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উগ্র আলোকেও লোকটিকে স্পষ্টভাবে চিনিতে পারি নাই। হয়তো আমারই নির্বুদ্ধিতা, কোনও বস্তুকে যাচাই করিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য

নির্ধারণ করিবার বিদ্যা এত বয়সেও অর্জন করিতে পারি নাই। অথচ শুনিয়াছি; এই বিদ্যাটাই নাকি চরম বিদ্যা—শিক্ষা, সংস্কৃতি, এমন কি দর্শনশাস্ত্রেরও শেষ সাধনা।

* * *

গুরুতর সংবাদটি আমাকে যিনি প্রথম দিলেন, তিনি সম্ভবতঃ সুবোধ-বাবুর ব্যবসায়-ঘটিত বন্ধু; উত্তেজনা-উদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, 'খবর শুনেছেন বোধ হয়?'

'কিসের খবর?'

'শোনেন নি তা হ'লে!'—হাস্যোজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি আকাশের পানে তুলিয়া তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, 'বড়ই দুঃসংবাদ। সুবোধবাবুর স্ত্রী—, তাঁকে কাল রাত্তির থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সেকি! কোথায় গেলেন তিনি?'

'যা শুনছি—এক ছোকরা খুব ঘন ঘন যাতায়াত করত, তার সঙ্গেই নাকি কাল রাত্রে—।' তাঁহার বাম চক্ষুটি হঠাৎ মুদিত হইয়া গেল।

মোটের উপর খবরটা যে মিথ্যা নয়, তাহা আরও কয়েকজন জানাইয়া গেলেন। কেহ স্ত্রী-স্বাধীনতার ধিক্কার দিলেন; কেহ বা গলা খাটো করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, ঠিক এই ব্যাপারটি যে ঘটিবে, তাহা তিনি পুরা এক বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির মস্তকের পশ্চাদ্দিকে টাক এবং বকেয়া টাকা না পাইলে স্বজাতি বাঙালীর নামে যে মকদ্দমা করিতে দ্বিধা করে না, তাহার স্ত্রী যে—ইত্যাদি।

সুবোধবাবুর কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল। নিরপরাধ হইয়াও যাহারা অপরাধীর অধিক লজ্জা ভোগ করে, তাঁহার অবস্থা তাহাদেরই মতো। সহানুভূতি জানাইবার বন্ধুর হয়তো অভাব হয় না, কিন্তু মুখের সহানুভূতিকে চোখের বিদ্রূপ যেখানে প্রতি মুহূর্তে খণ্ডিত করিয়া

দিতেছে, সেখানে সহানুভূতির মতো নিষ্ঠুর পীড়ন আর নাই। তাই মজা-দেখা বন্ধুর মতো সমবেদনার ছুতায় তাঁহার বাড়িতে গিয়া ধৃষ্টতা করিতে সংকোচ বোধ হইতে লাগিল।

তবু না গিয়াও থাকিতে পারিলাম না। মনের গহনে একটা নিষ্ঠুর শ্বাপদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সুবোধবাবুর মর্মপীড়া প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সেই বোধ হয়, সন্ধ্যার সময় আমাকে তাঁহার বাড়িতে টানিয়া লইয়া গেল।

অন্য দিনের মতো বাড়িতে মজলিসী বন্ধু কেহ নাই। বারান্দায় একাকী বসিয়া সুবোধবাবু মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে হাত বুলাইতেছেন; আমাকে দেখিয়া অন্যান্য দিনের মতো সহাস্য সমাদরে আহ্বান করিলেন, 'আসুন আসুন!'

স্ত্রী কুলত্যাগ করিলে মানুষ ঠিক কি ভাবে আচরণ করিয়া থাকে, তাহার অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সুবোধবাবুর ভাবগতিক স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না। যেন কিছুই হয় নাই। হাসিমুখে দুই চারিটা সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা, এমন কি একবার একটা রসিকতা পর্যন্ত করিয়া ফেলিলেন।

বেজায় অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। যাহার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছি, তিনি যদি দুঃখটাকে গায়েই না মাখেন, তবে সান্ত্বনা দিব কাহাকে? অপদস্থের মতো নীরবে হেঁটমুখে বসিয়া রহিলাম, প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিতেই পারিলাম না।

দিনের আলো নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর এক সময় চোখ তুলিয়া দেখিলাম, সুবোধবাবু তাঁহার তৌল-করা চক্ষু দিয়া আমার মনের কথাটা ওজন করিতেছেন। মুখে একটু হাসি।

চোখাচোখি হইতেই তিনি মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; তারপর বাগানের একটা ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের ডগার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আমার টুথ-ব্রাশ্টা কে চুরি করে নিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না।'

অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে চমকিয়া উঠিলাম, মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, 'টুথ-ব্রাশ্।'

তিনি তেমনই অর্ধ-নির্লিপ্তভাবে বলিলেন, 'হ্যাঁ, টুথ-ব্রাশ্। তুচ্ছ জিনিস, সংসারযাত্রা নির্বাহের একটা সামান্য উপকরণ; যে লোকটা চুরি করেছে, তার রুচির প্রশংসা করতে পারি না। কিন্তু তবু সাবধান হওয়া দরকার। ভাবছি, আর টুথ-ব্রাশ কিনব না।'

অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। আমার দিকে সহসা চক্ষু নামাইয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি কখনও দাঁতন ব্যবহার করেছেন? শুনেছি, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ভালো। মনে করছি, এবার থেকে ইউক্যালিপ্টাসের দাঁতন ব্যবহার করব। সস্তাও হবে, আর কিছু না হোক, চুরি যাবার ভয় থাকবে না। দাঁতন কেউ চুরি করবে না!'—বলিয়া হঠাৎ একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

* * *

তারপর সুবোধবাবুর সহিত আর দেখা হয় নাই। তবে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তাঁহার নাম দেখিতে পাই; তাহাতে মনে হয়, তাঁহার মোহমুক্ত বিষয়বুদ্ধি তাঁহাকে বৈষয়িক উন্নতির পথেই লইয়া চলিয়াছে।

তিনি আবার টুথ-ব্রাশ্ কিনিয়াছেন, অথবা দাঁতন দিয়াই কাজ চালাইতেছেন, সে সংবাদ কিন্তু খবরের কাগজে পাই নাই।

✓ দন্তরুচি

প্রেমের জন্য পাগল হইয়া যাইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না। ইতিহাসে একটিমাত্র পাকা নজির আছে : পারস্য দেশে মজনু লয়লার জন্য দেওয়ানা হইয়া গিয়াছিল। আমি আর একটি দৃষ্টান্ত জানি; তিনি বাংলাদেশের নীরদবাবু। বর্তমানে তিনি কাঁকে আছেন।

নীরদবাবুর বয়স কত হইযাছিল আমরা ঠিক জানি না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত—বড় জোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। বেশ মজবুত দেহ, মাথায় টাক পড়ে নাই; বিপত্নীক হইবার পর হইতে নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার দাঁতগুলি—

বিজ্ঞান ও ডাক্তারী শাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু দাঁতের কোনও ব্যায়াম আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কায়কল্পের তপস্বী বাবা মালবীয় মহাশয়ের দাঁতের কি ব্যবস্থা করিলেন জানিবার জন্য আমবা সকলেই উৎসুক আছি।

প্রেমের সহিত দাঁতের সম্বন্ধ নাই—কোনও কোনও লেখক এরূপ মনে করেন। প্রেম চিবাইয়া খাইবার বস্তু নয়, তাহা মানি। কিন্তু সাধারণতঃ প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে দন্তরুচিকৌমুদী যে অবহেলার বস্তু নয়, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শকুন্তলার যদি একটিও দাঁত না থাকিত, অথবা রোমিও যদি সদ্যোজাত শিশুর মতো ফোগ্‌লা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রেম কতদুর অগ্রসর হইত, তাহা বিবেচনার বিষয়।

কিন্তু যাক্, বাজে কথার মোহে নীরদবাবুর নিকট হইতে আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছি। শৈশবকালে নীরদবাবুর যাহারা নামকরণ

করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে সম্ভবতঃ পরিহাসের অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু বর্তমানে তাঁহার জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু এই বলিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিতেন যে, তাঁহার নামটি নিম্নোক্তভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। যথা—নি+রদ=নীরদ। কিন্তু ব্যাকরণ-ঘটিত রসিকতায় আমাদের রুচি নাই।

তাছাড়া, হোয়াট্'স্ ইন্ এ নেম!

নীরদবাবু হঠাৎ একটি পার্টিতে গিয়া প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিলেন। যুবতীটি চঞ্চলা, রসিকা, কলহাস্যনিপুণা—প্রথম আলাপেই নীরদবাবুর সহিত অন্তরঙ্গের মতো চটুল রহস্যালাপ করিয়া হাস্যবিচ্ছুরিত দশনচ্ছটায় তাঁহার চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে, নীরদবাবুর বিপত্নীক হৃদয়কোটরে বহুকালরুদ্ধ বাষ্প বয়লারের মতো তাঁহাকে ফাটাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল।

কিন্তু তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কেবল মুচকি মুচকি হাসিয়াছিলেন। এই আত্মনিগ্রহের ফলে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহা হইতে কেহ যেন না মনে করেন যে, নীরদবাবু অত্যন্ত লাজুক অথবা বাক্যবিন্যাসে অপটু; তাহা হইলে তাঁহার প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে। পরন্তু তিনি পরম উদ্যোগী পুরুষ, প্রথম দিনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে পুনরায় সপত্নীক হইবার বাসনা জাগরূক হইয়া উঠিয়াছিল।

নীরদবাবুর মনোহারিণী মহিলাটির নাম—সুদতি দেবী। সম্ভবতঃ, নামটির কোনও মানে আছে, অভিধান দেখিলেই পাওয়া যাইবে। আজকাল অনেক মহিলারই নামের অর্থ জানিবার জন্য অভিধানের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু, হোয়াট্'স্ ইন্ এ নেম্!

উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া একদিন নীরদবাবু সুদতি দেবীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতিবেশীগণ মুগ্ধবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার মুখে শুভ্রমধুর হাসি ফুটিয়াছে।

ক্রমে প্রণয় দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। সুদতি দেবীর গৃহে নীরদবাবুর যাতায়াত নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিল। যাতায়াতের কোনও বাধা নাই, কারণ শ্রীমতী সুদতি সম্পূর্ণ স্বাধীনা, কোনও একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের নৃত্য ও সংগীতের শিক্ষয়িত্রী। ছাত্রীদিগকে নিয়মিত নৃত্য শিক্ষা দিবার ফলে শ্রীমতীর যৌবন অতিশয় দৃঢ় ও স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছিল; মুখ সর্বদাই হাস্যবিম্বিত। তাহা দেখিয়া নীরদবাবুর দন্তগুলিও সানন্দে বিকশিত হইয়া থাকিত। এইরূপে হাসিতে হাসি মেশামিশি হইয়া উভয়ের মনে রাসায়নিক মাদকতার উদ্ভব হইতে লাগিল।

সত্যই, প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর হাসিতে অদ্ভুত মাদকতা আছে। কিন্তু কোথা হইতে এই মাদকতা জন্মগ্রহণ করে—কেহ জানে না, হয়তো অশোকফুল্ল রক্তাধরে ইহার জন্ম, হয়তো কুন্দশুভ্র দন্তপংক্তিতে ইহার উদ্ভব! কে বলিতে পারে?

হাসিই তো প্রণয়ের প্রধান অভিব্যক্তি।

দুইজনের মনের কথা হাসির ইঙ্গিতে দুইজনের কাছে প্রকাশ পাইল—অর্থাৎ দুইজনেই রাজি। দুইজনের প্রাণেই যৌবন-জলতরঙ্গ! কে রোধ করিবে? হরে মুরারে!

উভয়েই বিবাহ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলা দরকার—নচেৎ বিবাহ হইবে কি করিয়া? শুধু হাসিলে আর যাহাই হোক, বিবাহ হয় না। শেষে নীরদবাবুই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন মনস্থ করিলেন।

কিন্তু নীরদবাবুর প্রাণে যৌবনের সঙ্গে কাব্যের জলতরঙ্গও জোয়ারের বেগে প্রবেশ করিয়াছিল। গতানুগতিকভাবে ঘরের কোণে বিবাহের প্রস্তাব করা তাঁহার পছন্দ হইল না। তার চেয়ে মুক্ত আকাশের তলে, গঙ্গার তীরে, সন্ধ্যার সমাগমে পশ্চিম দিগ্বধূ যখন সোনার স্বপ্ন দেখিবে, সেই সময় নির্জন বনপথে দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে—

নীরদবাবু স্থির করিলেন, আগামী রবিবারে তিনি শ্রীমতী সুদতিকে লইয়া মোটর-যোগে বটানিকাল-গার্ডেনে বেড়াইতে যাইবেন।

* * *

নিজে মোটর চালাইয়া নীরদবাবু বটানিকাল-উদ্যানের অভিমুখে চলিয়াছেন; পাশে সুদতি দেবী। নির্জন পথের উপর দিয়া হু হু করিয়া, মোটর চলিয়াছে, বায়ু সুবেগভরে সুদতি দেবীর অঞ্চল উড়িতেছে,—সোনালি অপরাহ্নে উন্মাথিত পথের ধূলি যেন আবীর হইয়া উঠিয়াছে।

নীরদবাবুর প্রাণে দুরন্ত আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি এক হাতে স্টিয়ারিং ধরিয়া সুদতির দিকে ফিরিলেন, গদগদ স্বরে বলিলেন, 'সুদতি, আমি বিপত্নীক।'

সুদতি সম্ভবতঃ পূর্বেই এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি কেবল মৃদুমধুর হাস্য করিলেন। সন্ধ্যালোকে তাঁহার দাঁতগুলি ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

নীরদবাবু কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নির্জলা সত্য কথা কখনও এরূপ ক্ষেত্রে সুফলপ্রসূ হয় না। তিনি নিজের অবিমৃষ্যকারিতা সংশোধন করিবার জন্য বলিলেন, 'কিন্তু আমার বয়েস—ইয়ে—পঁয়ত্রিশ বছর।'

সুদতি দেবী সলজ্জভাবে মুখটি নিচু করিয়া বলিলেন, 'আমার বয়েস —একুশ।'

চিত্রগুপ্ত যদি অন্তরীক্ষে থাকিয়া উক্ত কথাবার্তা শুনিতে পাইতেন, তাহা হইলে নিজের হিসাব-নিকাশ লইয়া বড়ই বিপদে পড়িতেন। কিন্তু নীরদবাবুর প্রাণ আর ধৈর্য মানিল না, তিনি স্টিয়ারিং-হুইল ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে সুদতির হাত চাপিয়া ধরিয়া আহ্লাদভরে বলিলেন, 'সুদতি, আমি তোমাকে—হি-হি-হি তোমার দাঁতগুলি ঠিক মুক্তোর মতো—মানে, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

মোটরখানা বোধ হয় এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল, সে নিমেষের মধ্যে পথের ধারের একটা খানা উল্লঙ্ঘন করিয়া পরিপূর্ণ একটি ডিগবাজি খাইয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িল।

সুদতি ও নীরদবাবু ঘাসের উপর ছিটকাইয়া পড়িলেন। দৈবক্রমে দুইজনের দেহই অক্ষত রহিল বটে, কিন্তু আকস্মিক বিপর্যয়ে মাথা ঘুলাইয়া গেল। বহিঃচেতনা ফিরিবার সঙ্গে নীরদবাবু দেখিলেন—তিনি পা ছড়াইয়া ভূমিতলে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে দুই পাটি দাঁত! চমকিয়া নীরদবাবু দাঁতের পাটি নিজ মুখের মধ্যে পুরিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সুদতি দেবীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনিও ঘাসের উপর বসিয়া ছিলেন; নীরদবাবু দেখিলেন, সুদতি দেবীও তাড়াতাড়ি দুই পাটি দাঁত মুখের মধ্যে পুরিতেছেন।

কিন্তু এ কি হইল! নীরদবাবুর দাঁত তাঁহার মাড়িতে বসিতেছে না কেন? ওদিকে সুদতি দেবীরও সেই অবস্থা। তবে কি—তবে কি—?

হাঁ, তাই বটে। দাঁত অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। মোটরের ঝাঁকানিতে উভয়েরই বাঁধানো দাঁত ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল···

হরে মুরারে!

অপরাহ্ণ ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিতেছে; পশ্চিম-দিগ্বধূ বোধ হয় সোনার স্বপ্নই দেখিতেছেন। নীরদবাবু দাঁতের পাটির দিকে তাকাইয়া হাবলার মতো দন্তহীন হাসি হাসিতেছেন।

* * *

নীরদবাবু যে পাগল হইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রতিবেশীরা ক্রমশঃ জানিতে পারিল। একদিন তাহারা দেখিল, নীরদবাবু স্রেফ মাথায় হ্যাট ও পায়ে বুটজুতা পরিয়া খোলা ছাদে পায়চারি করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন, 'ফোগলা! ফোগলা! হি-হি-হি!'

শ্লীলতা রক্ষার খাতিরে পাড়ার বিবাহিত লোকেরা পুলিসে খবর দিল তদবধি নীরদবাবু কাঁকে আছেন।

ধীরে রজনি!

পাশের বাড়িতে শানাই বাজিতেছে। কি মধুর শানাই বাজিতেছে! আজ ও-বাড়ির একটি মেয়ের বিবাহ।

মেয়েটিকে আমি দেখিয়াছি। নবোদ্ভিন্ন যৌবন, কিন্তু যৌবরাজ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় আর আনন্দ।

মেয়েটির নাম, শুনিয়াছি,—রজনী।

আজ তাহার বিবাহ।

ধীরে, রজনি,—ধীরে!

এখনও তুমি অন্ধ, তাই তোমার চোখে এত বিস্ময়, এত আনন্দ। যখন সোনার কাঠি স্পর্শে তোমার অন্ধতা ঘুচিয়া যাইবে, তখনও যেন তোমার দৃষ্টির বিস্ময় আর আনন্দ ঘুচিয়া না যায়। ধীরে রজনি—

তোমার হাতে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর জ্বলিতেছে তোমার অকলঙ্ক দেহবর্তিকায় কুমারী-মনের নিষ্কম্প শিখা। এই স্নিগ্ধ নির্মল দীপালোকে তোমার বাসরগৃহ আলোকিত হোক্।

আজ যে পথে তোমার অলক্ত-রাঙা চরণ অর্পণ করিলে, অভিসারিকার মতো তুমি চিরদিন সে পথে চলিও—সংগোপনে, কম্প্রবক্ষে, স্বপ্নবিজড়িত নেত্রে।

ওগো বধূ, রাখো তোমার লাজ
রাখো লাজ;
অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সীঁদুর বিন্দু আঁকো নাই কি শিরে,
হয়নি সন্ধ্যা সাজ?

দয়িত যে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে—অধীর উদ্বেল হৃদয়ে নবীনা অভিসারিকার পথ চাহিয়া আছে। তবু—ধীরে রজনি—। মন্দং নিধেহি চরণৌ। লঘু মন্থর পদে অভিসার-গৃহে প্রবেশ কর। অয়ি প্রথম-প্রণয়ভীতে, ব্রীড়ায় সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া তুমি প্রিয়-সমাগম কর। তোমার সুমধুর আনন্দ-বিস্ময়-মাখা অন্ধতা ঘুচিয়া যাক্—

When beauty and beauty meet,
All naked fair to fair—
The earth is crying—sweet—
And scattering—bright the air
Eddying, dizzying, closing round
With soft and drunken laughter
Veiling all that may befall.
After—after—

নন্দনবন-মধুপূর্ণ পাত্র তুমি পান কর। অয়ি কুমারি, তুমি নারী হও—
তবু—ধীরে রজনি—ধীরে—

শানাইয়ের সুরের সঙ্গে মিশিয়া মনটা বোধ হয় কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বাস্তবলোকে নামিয়া আসিলাম। পাশের ঘরে দাদা ও বৌদিদির কথাবার্তা কানে আসিল:

দাদা খিঁচাইয়া বলিলেন, 'জামাতে যে একটাও বোতাম নেই, এটা কি চোখে দেখতে পাওনা?'

বৌদিদি জবাব দিলেন, 'পারবনা আমি। থাকে না কেন বোতাম? তোমার যদি দশটা দাসী-বাঁদী থাকে তাদের দিয়ে শেলাই করিয়ে নাওগে।'

দাদা বলিলেন, 'তা তো বটেই, নবাব-বংশের মেয়ে তুমি, বোতাম শেলাই করতে পার্‌বে কেন!'

বৌদিদি ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, 'খবরদার বলছি, বাপ তুললে ভাল হবে না। তুমি কোন নবাব বংশের ছেলে শুনি? ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই!···ওরে লক্ষ্মীছাড়া, তুই থাম্‌বি, না কেবল বাপের মতো চেঁচাবি?'—বলিয়া দুই বছরের ছেলেটাকে দুম্‌দুম্‌ করিয়া পিটিতে লাগিলেন। ছেলেটা ব্যা ব্যা করিয়া তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিল।

এই সময় পাশের বাড়ির দরজায় ঘন ঘন শঙ্খ ও হুলুধ্বনি শুনা গেল। বর আসিয়াছে। বিবাহের আর দেরি নাই। এখনই দুইটি মানব-মানবী অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে! আমি লাফাইয়া গিয়া জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'ধীরে রজনি—ধীরে!'

কিন্তু শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে আমার গলা চাপা পড়িয়া গেল।

ধীরেন ঘোষের বিবাহ

শ্রীযুক্ত ধীরেন ঘোষের বয়স তিপান্ন বছর। তিনি অতি সঙ্গোপনে ট্রেনে চড়িয়া কাশী যাইতেছেন। উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা।

ধীরেনবাবু অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী। তাঁহার প্রথম পক্ষ হইতে কয়েকটি কন্যা আছে; সকলেই বিবাহিতা ও সন্তানবতী। গত বছর ধীরেনবাবুর স্ত্রী মারা গিয়াছেন। অতঃপর এ বছর তিনি আবার বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বয়স পঞ্চাশোর্ধে হইলেও তাঁহার শরীর এখনও বেশ মজবুত আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা কেহ বুঝিতে চায় না।

তিনি বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই চারিদিকে একটা মস্ত গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে; মেয়েরা কান্নাকাটি করিবে; জামাতা বাবাজীরা মুখ ভার করিবেন; পাড়ার ছোঁড়ারা বাগড়া দিবার চেষ্টা করিবে। তাই ধীরেনবাবু গোপনে গোপনে নিজের বিবাহ স্থির করিয়াছেন এবং একটিও বরযাত্রী না লইয়া চুপি চুপি কাশী যাইতেছেন। কাশীতে পাত্রী ঠিক হইয়াছে। একেবারে বিবাহ করিয়া বৌ লইয়া বাড়ি ফিরিবেন। তখন যে যত পারে চেঁচামেচি করুক, কিছু আসে যায় না।

রাত্রির অন্ধকারে হু হু শব্দে ট্রেন ছুটিয়াছে। ধীরেনবাবুর কামরায় দুটি মাত্র বাঙ্ক; একটিতে তিনি শুইয়া, অন্যটি খালি। ধীরেনবাবু কল্পনাপ্রবণ লোক নয়; অতীত বিবাহিত জীবনের স্মৃতি কিম্বা আগামী বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে না। তিনি মাঝে মাঝে ঝিমাইতেছেন, আবার জাগিয়া উঠিতেছেন। মন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ।

গভীর রাত্রে ট্রেন একটি স্টেশনে থামিল। কামরার বাহিরে কয়েকজন লোকের গলার আওয়াজ শুনিয়া ধীরেনবাবু ঘাড় তুলিয়া দেখিলেন।

'এই যে এ গাড়িতে একটা বাঙ্ক খালি আছে—তুমি উঠে পড়—'··· 'আর তোমরা ?'···আমরা অন্য গাড়ি খুঁজে নিচ্ছি···'উলু উলু উলু—'

একটি নব যুবক গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং শূন্য বাঙ্কটার উপর বিছানা পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ধীরেনবাবু মিটি মিটি চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ছোকরা নিশ্চয় বিবাহ করিতে যাইতেছে। কোঁচানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, বয়স আন্দাজ বাইশ-তেইশ। চেহারা মন্দ নয়।

বিছানা পাতা শেষ হইলে যুবক বিছানায় বসিয়া তরিবত করিয়া একটি সিগারেট ধরাইল।

নিরুৎসুক চক্ষে তাহাকে দেখিতে দেখিতে ধীরেনবাবুর মনে হইল যুবককে তিনি পূর্বে কোথাও দেখিয়াছেন। সম্প্রতি নয়, অনেক দিন আগে। কবে কোথায় দেখিয়াছেন মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহার বসিবার ভঙ্গী অঙ্গ সঞ্চালন—সবই যেন চেনা চেনা।

ধীরেনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন,—'কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে ?' যুবক চমকিয়া তাকাইল। এতক্ষণ সে ধীরেনবাবুকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই ; এখন দেখিল একটা চিম্‌সে গোছের বুড়ো শুইয়া আছে। সে তাচ্ছিল্যভরে বলিল,—'গয়া।'

'বিয়ে করতে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

ধীরেনবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন এবং ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘুম কিন্তু সহসা আসিল না, কে এই ছোকরা ? কোথায় তাহাকে

দেখিয়াছেন?—আর একটা অদ্ভুত যোগাযোগ—আজ হইতে ত্রিশ বছর পূর্বে ধীরেনবাবুও গয়ায় বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন—এমনি রাত্রির ট্রেনে চড়িয়া। তাহার প্রথম শ্বশুরবাড়ি ছিল গয়ায়।

আশ্চর্য।

নানা অসংলগ্ন কথা চিন্তা করিতে করিতে ধীরেনবাবু শেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন; কিন্তু মনের মধ্যে একটা অশ্বস্তি খচ্‌খচ্‌ করিতে লাগিল।

প্রত্যুষে ধীরেনবাবুর ঘুম ভাঙিল। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, যুবক নিজের বাঙ্কে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি উঠিয়া বসিয়া একদৃষ্টে যুবকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার বুকের ভিতরটা আনচান করিতে লাগিল। চিনি চিনি করিয়াও কেন চিনিতে পারিতেছেন না? স্মৃতিশক্তি ভাল; এমন ভুল তো তাঁহার কখনও হয় না। অথচ এই যুবকের সহিত তাঁহার একটা অতি ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে—গাঢ় পরিচয় আছে—

চলন্ত গাড়ির একটা আচম্‌কা ঝাঁকানি খাইয়া যুবকের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

'পরের স্টেশন কি গয়া?'

ধীরেনবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ।'

যুবক তখন স্নান-কামরায় গিয়া মুখহাত ধুইয়া আসিল; ক্ষিপ্র হস্তে বিছানা গুটাইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ধীরেনবাবু দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর অজ্ঞাত সংশয়ে তোলপাড় করিতে লাগিল। এমন অস্থিরতা ও উদ্বেগ তিনি জীবনে কখনও ভোগ করেন নাই। অথচ কেন যে এই উদ্বেগ তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কেবল একটা মানুষকে চিনতে না পারার জন্য এতখানি ব্যাকুলতা কি সম্ভব?

গাড়ির গতি মন্থর হইল। গয়া আসিয়া পড়িয়াছে। যুবক সিগারেট ধরাইয়া প্রশ্ন করিল,—'আপনি কোথায় যাবেন ?'

ধীরেনবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—'কাশী।'

যুবক তাঁহার প্রতি এমন একটি দৃষ্টিপাত করিল যাহার অর্থ—কাশী যাবার বয়স হয়েছে বটে।

গয়া স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল। যুবক নামিবার উপক্রম করিল।

ধীরেনবাবু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নাম কি ?'

যুবক বিরক্তভাবে ফিরিয়া তাকাইল।

'আমার নাম শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।' বলিয়া সে নামিয়া গেল।

ধীরেনবাবু স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। দীর্ঘকাল তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

যে লোকটিকে তিনি কিছুতেই চিনিতে পারিতেছিলেন না, তাহাকে চিনিতে আর বাকি নাই। সে আর কেহ নয়—তিনি স্বয়ং। ত্রিশ বছর পূর্বে ধীরেনবাবু যাহা ছিলেন এই যুবকটি সেই। শুধু চেহারার সাদৃশ্য বা নামের ঐক্য নয়—সাক্ষাৎ তিনিই। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল ? ধীরেনবাবু স্বপ্ন দেখিতেছেন না তো ? তিনি চোখ রগড়াইয়া চারিদিকে চাহিলেন। না, স্বপ্ন নয় ; সূর্য উঠিয়াছে। তিনি জাগিয়াই আছেন।

তাঁহার স্মৃতিশক্তিও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনে পড়িল, ত্রিশ বছর পূর্বে তিনি যখন বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন গাড়ির কামরায় একটি বৃদ্ধ ছিল। বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে ? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—গয়া। তারপর যাহা

আজ ঘটিয়াছে সমস্তই ঘটিয়াছিল। বৃদ্ধ শেষ মুহূর্তে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। নাম শুনিয়া বৃদ্ধের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়াছিল—

সে বৃদ্ধ কে ছিল? সেও কি যুবক ধীরেনবাবুকে দেখিয়া নিজের অতীত যৌবনকে চিনিতে পারিয়াছিল। এমনিভাবে কি অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে?

এই সময় তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া গাড়ি হইতে নামিতে গেলেন। দেখিলেন গাড়ি চলিতেছে। গাড়ি আবার কখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন।

তাঁহার যৌবন এখন গয়ায়। আজ রাত্রে তাহার বিবাহ। তবে ধীরেনবাবু কোথায় যাইতেছেন? গয়ায় তাঁহার বিবাহ, তিনি কাশী চলিয়াছেন কি জন্য?

অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। বিশ্বাসের যোগ্য নয়। একটা মানুষের দুইটা বিভিন্ন বয়স যুগপত্ত বর্তমান থাকে কি করিয়া? কিন্তু ধীরেনবাবু সর্বান্তঃকরণে জানেন ইহাই সত্য। ঐ যুবক যে তিনিই তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা অবশ্য তিনি জানেন না। কিন্তু সম্ভব হইয়াছে। ইহাই কি যথেষ্ট নয়?

পরের স্টেশনে গাড়ি থামিতেই ধীরেনবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন। কাশী যাইবার আর প্রয়োজন নাই; দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহেরও প্রয়োজন নাই।

আজ রাত্রে তাঁহার প্রথম পক্ষের বিবাহ।

নাইট ক্লাব

বিশ্বাস না-করিতে হয় না-করুন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে আমি বাধ্য। এই কলিকাতা শহরেই দু'চারটি নাইট ক্লাব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। গোপনে গোপনে তাহাদের নৈশ অধিবেশন বসিয়া থাকে; অত্যাধুনিক কয়েকটি রস-পিপাসু নরনারী ভিন্ন ইহাদের সন্ধান কেহ জানে না। পাশ্চাত্ত্য মতে পরকীয়া প্রীতির পুনঃ প্রবর্তন করাই এই নব-রসিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। সকলেই জানেন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অগ্রদূত হুইস্কি এবং ভগ্নদূত নাইট ক্লাব। ইহার পর আর কিছু নাই; তস্মাৎ পরতরং নহি।

যুবতীটির নাম মীনাক্ষী। সংক্ষেপে মীনা। বাপ বড়মানুষ এবং ভালো মানুষ; তদুপরি কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা। সুতরাং কুমারী মীনার মনে সহজেই নারীজাতির দুঃসহ পরাধীনতার ব্যাথা পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নারীর যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহার অবাধ প্রগতির জলতরঙ্গ শীঘ্রই বাঁধ ভাঙ্গিয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না। পিতা অর্থব্যয় করিয়া তরুণী কন্যাকে পালন করিতে বাধ্য; স্বামী যদি খোরপোষ দিতে অস্বীকৃত হয়—আদালত আছে! কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা নারীর যথেচ্ছ প্রগতিতে বাধা দিতে চায় কোন্ অধিকারে?

মীনার মনোভাব তপ্ত দুগ্ধের মতো পারিবারিক কটাহ ছাপাইয়া ছাপার অক্ষরে উথলিয়া পড়িয়াছিল। এই ফেনোচ্ছলতা যে আধারে সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার নাম—'পেয়ালা'। 'পেয়ালা' সাপ্তাহিক পত্রিকা, নবতন্ত্রের নবীন তান্ত্রিক শ্রীমান ফাল্গুনী ইহার স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক।

শ্রীমান ফাল্গুনী তাঁহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিতেন—'বাঙালী, ছিঁড়ে ফেল এই পুষ্পরচিত নিগড়ের বন্ধন! নরনারীর যৌন সম্পর্কে নির্বিঘ্ন করো; বিবাহের অন্ধকূপে আবদ্ধ হয়ে তোমার পৌরুষ নির্বীর্য হয়ে পড়েছে—তাকে মুক্তি দাও। দোহাই তোমার, বিয়ে করো না।

'নিতান্তই যদি বিয়ে করতে চাও—সখ্য-বিবাহ করো। যাচাই-বিবাহ করো। আর তা যদি না করো, রসাতলে যাও।'

যাচাই-বিবাহ! কথাটা খড়ের আগুনের মতো তরুণদের হৃদয়ে জ্বলিতে থাকিত। আহা, কবে সেদিন আসিবে যখন যাচাই করিতে করিতেই জীবন কাটিয়া যাইবে; বিবাহ করিয়া ভারগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন হইবে না।

শুধু তরুণ নয়, তরুণীরাও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মীনা ফাল্গুনীকে চিঠি লিখিল,—

'ধন্য আপনার নাম ফাল্গুনী! আপনার 'পেয়ালা' দিন দিন ফাল্গুনের 'উচ্চহাস্য অগ্নিরসে' ভরে উঠুক! সংযমের ভীরুতা অপনীত হোক্।

'কিন্তু নারী? যোগ্য সহচর যাচাই করে নেবার অধিকার তারও চাই। নারী আর গুটীপোকা নয়, সে এখন প্রজাপতি; ফুলে ফুলে মধুপান করে বেড়াবার অধিকার তারও আছে। একথা ভুলে যাবেন না।'

উত্তরে ফাল্গুনীর সম্পাদকীয় স্তম্ভ উত্তেজিত হইয়া উঠিল:

'ভুলি নাই' ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া! আপনাকে প্রিয়া বললাম বলে কিছু মনে করবেন না। সমস্ত নারীজাতি সমস্ত পুরুষজাতির প্রিয়া—Private Property আমরা মানি না। আমাদের কাপালিক হতে হবে; হতে হবে নির্ভীক, হতে হবে নির্ঘৃণ, হতে হবে নির্লজ্জ।

নিষ্কোষিত করতে হবে আমাদের মনকে—অসির মতো এবং সেই অসি দিয়ে কেটে ফেল্‌তে হবে গাঁটছড়ার গ্রন্থীকে। যৌন জীবনে আমরা গাঁট রাখব না, এই আমাদের শপথ।'

অতঃপর সম্পাদক ও লেখিকার মধ্যে পত্রাঘাতজনিত ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না। চাক্ষুস দেখাশুনা না হইলেও মনের মিল যেখানে এত গভীর সেখানে দূর হইতেই মিলনোৎকণ্ঠা জন্মিতে পারে। ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধু—!

এইবার নাইট ক্লাবের আবির্ভাব। 'পেয়ালা' সম্পাদকের মানসিক অবস্থা অত্যাধুনিক হইলেও হাতে-কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতা একটু কাঁচা ছিল। তাই একদিন এক নবলব্ধ গ্রাজুয়েট বন্ধুর নিকট ক্লাবের সন্ধান পাইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা পুলকিত হইয়া উঠিল। আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার এই প্রথম সুযোগ। তিনি মীনাকে লিখিলেন ঃ

'তোমাকে এখনও চোখে দেখিনি, তবু তোমার অন্তঃসত্তা আমার অন্তঃসত্তাকে চুম্বকের মতো টানছে। কিন্তু আমাদের সাধারণ মিলন নরনারীর মতো হ'লে চলবে না। মুক্তির মানসতীর্থে আমাদের যৌন মিলনের মঙ্গলশঙ্খ বাজবে। সে তীর্থ—নাইট ক্লাব।

'সেই তীর্থে আমরা যাব। ঠিকানা দিচ্ছি। নিশীথ নগরীর নিদ্রিত বুকের ধুক্‌ধুকুনি আমরা শুনতে পাব! চক্ষের প্রদীপ জ্বেলে আমরা পরস্পরকে খুঁজে বেড়াব। বহু তীর্থযাত্রীর মধ্যেও পরস্পর চিনে নিতে পারব না কি ?'

প্রত্যুত্তরে মীনা লিখিল, 'তোমার বাঁশি শুনেছি। যাব আমি অভিসারে ; সহস্র লোক যদি সেখানে থাকে তবু তোমাকে চিনে নেব।

'আমার ভয় করছে না, বুক ঢিবঢিব করছে না। আমি যাবই। নিশ্চিন্ত থাকো।'

* * *

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ঘর; অনেকগুলি নরনারী এখানে সেখানে বসিয়া নিম্নস্বরে ঠাট্টা-তামাশা ও পানভোজন করিতেছে; সকলেরই চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার দীপ্তি। একটি বারো-আনা-উলঙ্গ যুবতী মাঝে মাঝে আসিয়া ছোট ছোট টেবিলগুলি ঘিরিয়া নাচিয়া যাইতেছে। ঐক্যতান বাদ্য-যন্ত্রের চাপা আওয়াজ সকলের কানে কানে একটা অকথ্য ইঙ্গিত করিতেছে।

নাইট ক্লাব। মুক্তির তীর্থ। রাত্রি যত গভীর হইতেছে, বন্ধন ততই শিথিল হইয়া আসিতেছে। তূরীয়ানন্দে উপনীত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

ঘরের এক কোণে নিজেকে যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন করিয়া মীনা একটা ক্ষুদ্র সোফায় বসিয়াছিল। সম্মুখে একটা টবের পাম গাছ পাতার ঝালর দিয়া তাহাকে কতকটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু সুন্দরী যুবতীকে পাতা ঢাকা দিয়া আড়াল করা যায় না। অনেকগুলি শ্যেন-চক্ষু এই ক্ষুদ্র পাখীটির প্রতি নজর রাখিতেছিল। পরিপাটি বেশধারী একটি কদাকার যুবক অদূরে অন্য একটি টেবিলে বসিয়া নিবিষ্ট মনে সবুজ রঙের এক প্রকার পানীয় চুমুকে চুমুকে আস্বাদন করিতেছিল এবং ঘাড় ফিরাইয়া মীনাকে দেখিতেছিল। সেও একাকী, সঙ্গিনী নাই।

মীনার বুক ঢিব ঢিব করিতেছে, গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। প্রায় আধ ঘণ্টা সে এখানে বসিয়া আছে, কিন্তু কই ফাল্গুনীকে তো

চিনিতে পারিল না? মনে মনে সে ফাল্গুনীর যে চেহারা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল সেরূপ চেহারার লোক তো একটিও এখানে নাই! সে কল্পনা করিয়াছিল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিপ্‌ছিপে একটি যুবক; চোখে ঈষৎ ধোঁয়াটে কাচের চশমা, ঠোঁটের কোণে উচ্চ অঙ্গের একটু হাসি। সে আসিয়া মীনার সম্মুখে দাঁড়াইবে, গভীর দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিবে, 'মীনা, চিনেছি তোমাকে। এসো আমার সঙ্গে।' মীনা অমনি উদ্বেলিত হৃদয়ে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া দিবে; বলিবে—

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী!

কিন্তু কই? কোথায় তাহার মানস-ফাল্গুনী? ব্যাকুল দৃষ্টিতে মীনা আর একবার চারিদিকে চাহিল। বারো-আনা-উলঙ্গ মেয়েটা নির্লজ্জ ভঙ্গীতে নাচিতেছে। সকলেরই মুখে চোখে এমন একটা ভাব যাহা দেখিতে সংকোচ বোধ হয়। অদূরে বসিয়া কদাকার যুবকটা তাহার দিকে তাকাইয়া একটা বিশ্রী হাসি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার নাক মুখ হইতে সিগারেটের ধোঁয়া ধীরে ধীরে নিঃসৃত হইতেছে, যেন তাহার অন্তরের কলুষিত বাষ্প বিবর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

চোখ বুজিয়া মীনা শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। কি করিবে? যদি ফাল্গুনী না আসে? এখান হইতে বাহির হইবে কি করিয়া? ইহারা যদি বাহির হইতে না দেয়?

ঘাড়ের কাছে একটা তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। কদাকার যুবক তাহার পিছনে আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'আমিও একাকী, তুমিও একাকী—হে-হে-হে। আসুন না, পরস্পর সান্ত্বনা দেওয়া যাক।'

'না?' কুঁকড়াইয়া মীনা একপাশে সরিয়া গেল। তাহার বুক ভীষণ ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।

কদাকার যুবক পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'নবাগতা দেখছি—প্রথমটা একটু বাধো বাধো ঠেকে। একপাত্র শ্যাম্পেন আনাব? খেলেই সংকোচ কেটে যাবে। হেঃ-হেঃ-হেঃ!'

মূক হইয়া বসিয়া মীনা কাঁপিতে লাগিল। এ কি জঘন্য স্থানে যে একাকিনী আসিয়াছে! হঠাৎ তার মস্তিষ্ক-রন্ধ্রে ক্রোধের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। ঐ ফাল্গুনীটা—একটা—একটা—শয়তান! তাহার অন্তঃসার-শূন্য লেখায় ভুলিয়া মীনা আজ নিজের একি সর্বনাশ করিতে বসিয়াছে! না না, এ স্বাধীনতা সে চায় না। এই নির্লজ্জ পাশবিকতার চেয়ে বোরখা মুড়ি দিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকাও ভালো। সে প্রজাপতি হইতে চাহিয়াছিল, ভগবান তাহাকে গুবরে পোকাদের মধ্যে আনিয়া ছাড়িয়া দিলেন কেন?

ঘরের আলো যে অলক্ষিতে কমিয়া আসিতেছে তাহা মীনা বুঝিতে পারে নাই। একটা একটা করিয়া বাল্‌ব্‌ নিবিয়া যাইতেছে। ঘরটা যখন ছায়াময় হইয়া আসিয়াছে তখন মীনা হঠাৎ লক্ষ্য করিয়া আতঙ্কে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকের অস্পষ্টতার ভিতর দিয়া যে কলকূজন আসিতেছে তাহা আলোকের বন্দনা নয়, তমসার প্রশস্তি।

কদাকার যুবক মীনার আঁচল টানিয়া বলিল, 'বসুন না, এই কি যাবার সময়?'

আঁচল ছাড়াইয়া মীনা পলাইবার চেষ্টা করিল, কদাকার যুবক তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

'এখনি তো অন্ধকার হয়ে সবাই সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো মিশে যাবে। এ সময় হাত ছাড়তে নেই! হেঃ-হেঃ-হেঃ—'

মীনা একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সময়ে কোথা হইতে আর একটা হাত আসিয়া কদাকার যুবকের কবল হইতে মীনার হাত ছিনাইয়া লইল। ত্রাস-ব্যাকুল চক্ষে মীনা একবার এই নবাগতের পানে চাহিল, তারপর ঘর অন্ধকার হইয়া গেল।

নূতন স্বর মীনার কানে কানে বলিল, 'আসুন, আপনাকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।'

নূতন কণ্ঠস্বর শুনিয়া মীনা আশ্বাস পাইল। চকিতের জন্য যে মুখখানা সে দেখিতে পাইয়াছিল তাহাও ভদ্রলোকের মুখ—লালসার পাঁক-মাখানো নয়। মীনা সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'শিগগির চলুন, আমি নিশ্বাস ফেলতে পারছিনা।'

অবরুদ্ধ উত্তপ্ত অন্ধকারে কিছুক্ষণ সাবধানে চলিবার পর একটা দরজা, আরো খানিকটা দূর যাইবার পর আর একটা দরজা। তারপর—

আঃ—! খোলা আকাশের মুক্তবাতাস। মধ্যরাত্রির নির্জন পথে জনমানব নাই; শুধু তাহারা দু'জন। ল্যাম্প পোস্টের নিচে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ কম্পিত নিশ্বাস টানিয়া মীনা বলিল, 'একটা ট্যাক্সি। আপনি আমাকে দয়া করে বাড়ি পৌঁছে দিন, আমি একলা যেতে পারব না।'

ট্যাক্সিতে চলিতে চলিতে মীনা অস্ফুট ব্যাকুলতায় বারবার বলিতে লাগিল, 'আর কক্ষনো যাব না—কক্ষনো না—উঃ!' কদাকার যুবকের হাতের স্পর্শ তাহার হাতে যেন এখনও পচা অশুচিতার মতো লাগিয়া আছে।

চোখের জলের ভিতর দিয়া সে পাশের যুবকটিকে দেখিল। সুশ্রী নয়—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিপছিপে গঠন নয়, চোখে ধোঁয়াটে কাচের চশমাও নাই। যা দু-একটি কথা সে বলিয়াছে তাহাও নিতান্তই মামুলী। অথচ—

মীনা কহিল, 'ফাল্গুনীটা একটা কেঁচো !'

যুবক সহানুভূতিপূর্ণ ঘাড় নাড়িল ; ফাল্গুনী কে তাহা জানিবার ঔৎসুক্য পর্যন্ত দেখাইল না।

মীনা বলিল, 'এই প্রথম—এর আগে আমি আর কখনো ওরকম জায়গায় যাই নি।'

যুবক গলার মধ্যে সমবেদনাসূচক শব্দ করিল।

'আপনি ভাগ্যিস গিয়ে পড়েছিলেন, নইলে—'

যুবক একটু কাশিয়া বলিল, 'আমারও এই প্রথম।'

মীনা হঠাৎ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, 'ফাল্গুনী কে জানেন ? একটা নোংরা দুর্গন্ধ সাপ্তাহিকের সম্পাদক। তার মুখ দেখলে পাপ হয়, তার লেখা পড়লে গঙ্গাস্নান করতে হয়। আর যদি কখনো আমি !'

ট্যাক্সি বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।

মীনা অপ্রগল্‌ভ সহজতায় যুবকের হাত ধরিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আমাকে খুব খারাপ মেয়ে মনে করবেন না।—ফাল্গুনীটা নিশ্চয় মদ খায়।—মুক্তি কাকে বলে আমি আজ টের পেয়েছি। বাবার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। কাল আসবেন কি ?'

নীরবে একবার মাথা ঝুঁকাইয়া যুবক প্রস্থান করিল।

পরদিনটা মীনার প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল ; কিন্তু যুবক আসিল না, সন্ধ্যাবেলা আসিল ফাল্গুনীর চিঠি। রাগে মীনার ইচ্ছা হইল চিঠি না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু নাইটক্লাবে নিজে না যাওয়ার কি কৈফিয়ত দিয়াছে তাহা জানিবার জন্য চিঠি পড়িতে হইল—

'মীনা, তুমি আমায় বিয়ে করবে ?

'কাল বলতে পারলুম না। তুমি ট্যাক্সিতে আমাকে যা বলেছিলে সব সত্যি। শুধু—আমি মদ খাইনা, সত্যি বলছি। একবার খাবার

চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু যথাসর্বস্ব বমি হয়ে গেল। সে যাক্। কাল তোমাকে দেখে আমার সব নেশা ছুটে গেছে। 'পেয়ালা' ভেঙে ফেলছি ; আসছে হপ্তা থেকে আর 'পেয়ালা' বেরুবে না।

'মীনা, তোমার চোখের জল এত সুন্দর কেন ? তোমার রাগ এত মিষ্টি কেন ? তোমার ভয় এত মধুর কেন ?

'আমাকে বিয়ে করবে ?

'কুতসিত জিনিস না দেখলে সুন্দরকে চেনা যায় না। নাইট ক্লাব কাল আমাকে নারীর সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটি চিনিয়ে দিয়েছে।

'কাল তুমি আমার হাতে হাত রেখেছিলে। মনে হচ্ছে, সারা জীবন ধরে ঐ স্পর্শটি আমার চাই, না হ'লে চলবে না।

'তুমি আমায় বিয়ে করবে ?'

নারীর মূল্য

বৈরাগ্য সাধনের পক্ষে শংকর-ভাষ্যের চেয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বেশি উপযোগী। মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইয়া অবধি এই কথাটা আমি বেশ ভালো করিয়া বুঝিয়াছি।

বৈরাগ্য-শতকের কবি লিখিয়াছেন বটে—স্তনৌ মাংসগ্রন্থী (আধুনিক লেখকগুলা একথাটা জানে না—মাংসপেশী লেখে), কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তাহা কিছুই নয়। মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা ও বৈরাগ্য-সাধনা এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া এ বিষয়ে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

এই দেখুন না, আজ সকাল বেলা আমার পত্রিকার আপিসে আসিয়া খবরের কাগজ খুলিতেই দেখিলাম,—একজন বৈরাগী-বৈজ্ঞানিক

লিখিয়াছেন যে, মানুষের শরীরের – সুতরাং সেই সঙ্গে নারীর শরীরের —সমস্ত মাল-মশলা আলাদা করিয়া দাম কষিলে তাহার মূল্য দাঁড়ায় মোটে আঠারো টাকা। বেশির ভাগ জিনিসই বাজে—বাজারে চলে না; মূল্যবান পদার্থের মধ্যে—ফস্ফরাস্! অতএব ইহার পর, তরুণী সুন্দরী লেখিকা হাসিহাসি মুখে কবিতা লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে আর আমার ভয় কি? সম্পাদকদের মধ্যে যাঁহাদের বয়স কাঁচা তাঁহাদের সকলকেই আমি পদার্থ-বিজ্ঞান পড়িতে বলি। রামানন্দবাবু না পড়িলেও ক্ষতি নাই।

হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না; বৈরাগী-বৈজ্ঞানিক মহাশয় যোগ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন মেয়ে মানুষের মূল্য ঠিক আঠারো টাকা,— অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাহাই পড়িতেছি, এমন সময় পর্দা সরাইয়া একটি হাসি-খুশি মুখ ঘরে প্রবেশ করিল।

এক নজরে সমস্ত চেহারাখানা আগা গোড়া দেখিয়া লইলাম। বয়স সতের-আঠারো, পায়ে হাই-হীল জুতা, বাঁ হাতের কব্জি হইতে ভ্যানিটি ব্যাগ্ ঝুলিতেছে, বাঁকা সিঁথি, আর চোখ মুখ গড়ন—

এক কথায়, ঘোর সুন্দরী। বুঝিলাম, বিপদ উপস্থিত—এবং কবিতা।

বৈরাগ্যের প্রথম সোপান স্ত্রীজাতির প্রতি রূঢ়তা। আমি তাহাকে বসিতে না বলিয়া কঠোর স্বরে কহিলাম, 'আপনার মূল্য আঠারো টাকা।'

যুবতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল, বলিল, 'আঠারো টাকা? মোটে!...'

বাংলাদেশে এরূপ স্ত্রী-কবি কখনো দেখি নাই, কথাটা যেন গায়েই মাখিল না। তাই আরো তীব্রভাবে বলিলাম, 'সতের টাকাও হতে পারে। কারণ আপনি তন্বী—মানে, আপনি রোগা, শরীরে বেশী মাল

নেই। তাছাড়া, আপনার চামড়ায় পিগ্‌মেণ্টের অভাব—যেহেতু আপনি ফরসা। এই দুই দফায় এক টাকা কাটা গেল। আপনার দাম সতের টাকা।'

যুবতী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্মিত-মুখে বলিল, 'তাই তো, তবে উপায়? মোটা হ'লে দাম বাড়তে পারে কি?'

বুঝিলাম, রসিকতা করিতেছে। রসিকার বিরুদ্ধে বৈরাগ্য রক্ষা করা অতিশয় কঠিন, তাই আমি কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ শ্লেষ মিশাইয়া বলিলাম, 'আপনার শরীরে যে লোহা আছে তা থেকে একটি মাত্র পেরেক তৈরি হয়।'

যুবতীর চোখে দুষ্ট হাসি নৃত্য করিয়া উঠিল, সে বলিল, 'আর বঁড়শি?'

আমি বলিলাম, 'তা জানিনা, কাগজে কিছু লেখেনি। আরো শুনুন, আপনার মধ্যে যে গন্ধক অর্থাৎ সাল্‌ফার আছে তা দিয়ে মাত্র পাঁচটি দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি হতে পারে—তার বেশী নয়।'

যুবতীর গাল হাসির আবেগে টোল খাইয়া গেল, সে মুখ টিপিয়া বলিল, 'এতখানি আগুন যে আমার মধ্যে আছে তা আমি নিজেই জান্‌তুম না'

আমি বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম; স্ত্রী-কবিরা তো এমন ভাবে কথা বলে না, তাহারা কেবলই গলিয়া নেতাইয়া পড়িতে চায়। এ কিরূপ স্ত্রী-কবি? বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি কি রকম তরুণী? আপনার কি আত্মসম্মান জ্ঞান নেই? আমার কথা শুনে আপনার রাগ হচ্ছে না? এখনো চলে যাচ্ছেন না কেন?'

যুবতী চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া বসিয়া বলিল, 'আপনার মাথায় ছিট আছে আমি জানি।'

আমাব মাথায় ছিট আছে! না, আর শুধু-বৈরাগ্যে শানাইবে না, এই যুবতীটাকে ভালো রকম শিক্ষা দিতে হইবে। হাত বাড়াইয়া চাপা গর্জনে বলিলাম, 'দেখি, বার করুন আপনার কবিতা।'

'কবিতা!'—যুবতী ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিল।

'হ্যাঁ কবিতা। আপনি কবিতা আনেন নি?'

যুবতী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, একটা লিখব ভেবেছিলুম, কিন্তু হয়ে ওঠে নি।'

'তবে আপনি চান কি!'

'আমার দাদার বিয়েতে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে চাই।'

'আপনার দাদা!'

'হ্যাঁ—আমার দাদা। কেন, আমার কি দাদা থাকতে নেই?'

মনে মনে ভাবিলাম, দাদা যদি বা থাকে সে অতি অপদার্থ দাদা। এমন সাংঘাতিক একটা ভগিনীকে অম্লানবদনে লোক সমাজে ছাড়িয়া দিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার দাদা কে?'

সে বলিল, 'আমার দাদার নাম সৌরীন্দ্রনাথ—'

আমি লাফাইয়া উঠিলাম, 'অ্যাঁ! সৌরীন্ আপনার—তোমার দাদা? তাব মানে—তাব মানে—তুমি পলা!'

সে বলিল, 'হ্যাঁ আমি পলা, মানে প্রমীলা দেবী। চিনতে পেরেছেন?'

আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম, 'না। অনেক দিন আগে দেখেছি—প্রায় সাত-আট বছর। সৌরীন্টা কোথায়? সে কলকাতায় এলো কবে?'

'আমরা সবাই কাল এসেছি। আজই বিয়ে, তাই তিনি আসতে

পারলেন না, তাঁর বদলে আমি এসেছি। ভেবেছিলুম আমাকে চিনতে পারবেন।'

আমি ক্ষুব্ধ ভাবে বলিলাম, 'আমার সন্দেহ হয়েছিল তুমি একজন স্ত্রী-কবি।'

পলা বলিল, 'আপনাকে কিন্তু আমি দেখেই চিনেছিলুম, আপনি ঠিক তেমনি আছেন।'

আমি একটু ভ্রূকুটি করিয়া বলিলাম, 'আমার মাথায় কিন্তু ছিট নেই।'

পলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চললুম। আজ নিশ্চয় যাবেন তাহ'লে।'

আমি গোঁ ধরিয়া বলিলাম, 'আমার মাথায় কিন্তু ছিট নেই।'

পলা হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা নেই। তাহ'লে যাবেন তো?'

'যাব।'

বাড়ির ঠিকানা দিয়া পলা দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে, আমার বৈরাগ্য আর একবার চাগাড় দিয়া উঠিল, ডাকিলাম, 'শোনো।'

পলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, 'আবার কি হ'ল?'

আমি আঙুল তুলিয়া বলিলাম, 'তোমার শরীরে যে লোহা আছে তা থেকে একটি মাত্র পেরেক হয়, যে সালফার আছে—'

'মনে আছে, পাঁচটি দেশলাইয়ের কাঠি।'

আমি বলিলাম, 'স্ত্রী-কবি না হ'লেও তোমার দাম সতের টাকা—একথা ভুলো না।'

'আচ্ছা—বেশ!'

* * *

মাস তিনেক পরে, একদিন রাত্রে একটি পুষ্পকীর্ণ বিছানার পাশে

বসিয়া পলা আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'সতের টাকার জন্যে বৈরাগ্য বিসর্জন দিলে ?'

আমি মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলাম, 'আমার হিসেবে ভুল ছিল ; একটা জিনিস বাদ পড়ে গিয়েছিল।'

'কি ?'

'তুমি।'

প্রণয়-কলহ

অরুণা ও হিরণ পিঠোপিঠি হইয়া বিপরীত মুখে বসিয়াছিল। উদাস দৃষ্টি আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে উভয়েই আড়চক্ষে পরস্পরকে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

দু'জনের মনের সংশয় জাগিয়াছে—ও আমাকে ভালোবাসে না। তাহাদের জীবনে এই প্রথম কলহ।

অরুণা সহসা ফিরিয়া বসিল ; তাহার বয়স সতেরো, তাই ধৈর্য ও সংযম এখনও দানা বাঁধে নাই। অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

'কেন আনো বসন্ত নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল—
যদি বসন্তের শেষে ক্লান্ত মুখে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?'

হিরণও ফিরিল ; তাহার বৈরাগ্যের ভস্মাবরণের ভিতর দিয়া ঈষৎ তৃপ্তির ঝিলিক খেলিয়া গেল। তবু সে উদাস গম্ভীর স্বরে বলিল,

'কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে
রহিলে না ধ্যান ধারণার ?
সেই মায়া উপবন কোথা হ'ল অদর্শন
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুখাল পাথার !'

অরুণার চোখের জল এবার ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল,—

'বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর
মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি চুপি চাওয়া
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—'

অরুণার মুখখানি নতবৃন্ত পুষ্পের মতো বুকের উপর নামিয়া পড়িল। হিরণ বলিল—

'দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে—'

তাহার উদাসীন দৃষ্টি যেন আকাশের দুরবগাহ দূরত্বের মধ্যে ডুবিয়া গেল !

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর কাতর চক্ষু তুলিয়া অরুণা থরথর স্বরে বলিল,—

'এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা-কিছু আছিল মোর ?
যত শোভা, যত গান, যত প্রাণ
জাগরণ ঘুম-ঘোর ?

শিথিল হয়েছে বাহু-বন্ধন
মদিরা-বিহীন মম চুম্বন,
জীবন-কুঞ্জে অভিসার নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর ?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আনো নব গীতি আনো নব শোভা—'

প্রবল রোদনোচ্ছ্বাসে অরুণার কথা শেষ হইল না।

হিরণের মনটা গলিয়া টলমল করিতে লাগিল। কিন্তু তবু প্রথম কলহের নূতন ঐশ্বর্য সহজে ছাড়া যায় না। সে অন্য সুর ধরিল ; ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—

'তুমি যদি আমায় ভালো না বাসো
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই,
এমন কথার দেবনাক আভাষও
আমারো মন তোমার পায়ে বাধ্য নাই—'

অরুণা সচকিতে মুখ তুলিয়া চাহিল—

'ওগো ভালো করে বলে যাও—'

হিরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

'বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখতে দেখতে
ঝরে পড়ে যথায় তথায়।
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ ইন্দু

শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু।
তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
এটা বড়ই বর্বরতা
সময় যে নেই—সময় যে নেই!'

অরুণা অভিমান-ভরা দুই চক্ষু ক্ষণকাল হিরণের উপর স্থাপন করিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

হিরণ তখন উঠিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল,—

'মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে!'

অরুণাও চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

'বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।'

হিরণ কম্পিতহস্তে তাহার হাত ধরিল—

'হে নিরুপমা
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিও ক্ষমা।
তোমার দু'খানি কালো আঁখি 'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।

তোমার ললাটে নব বরষার
বরণ-ডালা।'

অরুণার চোখের ছায়া দূর হইল না ; সে বলিল,—

'ভালোবাসো কি না বাসো বুঝিতে পারি না—'

হিরণের বাহুবন্ধন আরও দৃঢ় হইল, সে বলিল,—

'তোমারেই যেন ভালো বাসিয়াছি
শতরূপে শত বার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'

অরুণার চোখের দৃষ্টিতে যুগান্তরেব কুহক ঘনাইয়া আসিল। উভয়ে পরস্পরের আরও নিকটবর্তী হইতে লাগিল। তারপর—

'রসভরে দুহুঁ তনু
থরথর কাঁপই—'

প্রেমিক

গল্পের শেষে একটি করিয়া মরাল বা হিতোপদেশ জুড়িয়া দিবাব ফন্দিটা বোধ হয় বিষ্ণুশর্মা আবিষ্কার কবিয়াছিলেন। সে অবধি, লাগায়েৎ বর্তমান কাল, যিনিই গল্প লিখিয়াছেন, তিনিই এই ফন্দিটি কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ শুরু হইতে ক্রমাগত মুখ খারাপ করিয়া শেষের কয়েক ছত্রে দুই চারিটি তত্ত্বকথা ছাড়িয়া পিত্ত রক্ষা করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান কথাসাহিত্যের বৈদর্ভী রীতি।

মাতাল সারা রাত্রি মাতামাতি করিয়া প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান সা।রয়া ঘরে ফিরিতেছে।

ইহার প্রতিকার আবশ্যক। যদি কিছু উপদেশ দিবার থাকে, গোড়াতেই সারিয়া লইতে হইবে। আরম্ভে নিম্বভক্ষণ সকল রসশাস্ত্রের বিধি হওয়া উচিত। অথ –

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের কয়েক শতাব্দী পরে আবার বাংলাদেশে নূতন করিয়া প্রেমের বান ডাকিয়াছে, কেহ কেহ ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়। মাঠে, ঘাটে, ট্রামে, রিক্সায়, কলেজে, সিনেমায়, তরুণ তরুণীরা অনবরত প্রেম করিতেছে। এত প্রেম কিন্তু ভালো নয়। সাধু সাবধান! কোনও বস্তুর অত্যধিক প্রাচুর্য ঘটিলে জ্ঞানী ব্যক্তির সন্দেহ হয়, ইহাতে ভেজাল আছে। বর্তমানে প্রেমের কারবারে কতখানি ভেজাল চলিতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ, অহৈতুকী প্রীতি যে এই নশ্বর সংসারে অতীব দুর্লভ তাহা বহু মহাজন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে মনের মানুষ মাত্র 'কোটীকে গুটিক' মিলে। বিদ্যাপতি ঠাকুর তো পরিষ্কার বলিয়াই দিয়াছেন যে প্রাণ জুড়াইতে লাখের মধ্যে একটি মানুষও তিনি পান নাই। সুতরাং, আজকাল যে সব তরুণ তরুণী পথে ঘাটে এই দুর্লভ বস্তু কুড়াইয়া পাইতেছে, তাহাদের কী বলিব? ভ্রান্ত? মূঢ়? না—স্বার্থপর?

আধুনিকদের ভ্রান্ত বা মূঢ় বলিলে চটাচটি হইবার সম্ভাবনা। তার চেয়ে তাহাদের ভণ্ড, স্বার্থসর্বস্ব, মতলববাজ, কুচক্রী বলাই শ্রেয়ঃ।

শ্রীমান বিমানবিহারীর সহিত কুমারী অনিন্দ্যার প্রণয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। যেহেতু বিমান কুকুর ভালোবাসিত, সেহেতু অনিন্দ্যার সহিত তাহার প্রেম ঘটিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কেহ ভুল

বুঝিবেন না। অনিন্দ্যা মানবনন্দিনী। অনিন্দ্যার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটিই এই যোগাযোগের ঘটক।

আরম্ভে পাত্র-পাত্রীর কুল-পরিচয় দান করাই বিধি। কিন্তু বিমান ও অনিন্দ্যার কুলজি ঘাঁটিবার আমাদের সময় নাই। মনে করিয়া লওয়া যাক, বিমান স্বায়ম্ভুব মনুর ন্যায় auto-fertilisation প্রক্রিয়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—তাহার বাপ-পিতামহ কস্মিন কালেও ছিল না। অনিন্দ্যাও বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়াছিল। তাহাতে আমাদের কাহিনীর কোনও ক্ষতি হইবে না।

একদা শহরের নির্জন প্রান্তে নবরচিত এক পার্কে বেড়াইতে বেড়াইতে বিমান লক্ষ্য করিল, একটি বেঞ্চির উপর এক তরুণী বসিয়া আছে, তাহার পায়ের কাছে খরগোসের মতো ছোট একটি কুকুর খেলা করিতেছে। বিমানের পদদ্বয় অজ্ঞাতসারে তাহাকে সেই দিকে লইয়া চলিল; একদৃষ্টে কুকুরের পানে তাকাইয়া সে বেঞ্চির এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল। কুকুরের গায়ে কুচকুচে কালো কোঁকড়া লোম, চোখ দুটি তরমুজ বিচির মতো। মুগ্ধ ভাবে তাহার দিকে হাত বাড়াইতেই সে টুকটুকে রাঙা জিভ বাহির করিয়া তাহার হাত চাটিয়া লইল। বিমান আবেগরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'কি সুন্দর কুকুর! পিকেনীজ বুঝি?'—বলিয়া কুকুরের স্বত্বাধিকারিণীর দিকে চোখ তুলিল।

দেখিল, কুকুরের স্বত্বাধিকারিণী টুকটুকে রাঙা ওষ্ঠাধর বিভক্ত করিয়া মিশমিশে কালো চোখে কৌতুক ভরিয়া হাসিতেছে। তাহার কোঁকড়া ঝামর চুলগুলি দুলিয়া উঠিল; সে বলিল, 'না, সায়ামিজ।'

তরুণীর কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানিনা, বিমান তীরবিদ্ধের মতো চমকিয়া উঠিল, তারপর কুকুরের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'তাই হবে। আমার ভুল হয়েছিল।—নাম কি?'

তরুণীর গালদুটি মুচকি হাসিতে টোল খাইয়া গেল, 'কার নাম জিগ্যেস করছেন? আমার?'

বিমান লাল হইয়া উঠিল, 'না না—মানে—ওর একটা নাম আছে তো—তাই—'

তরুণী টিপিয়া টিপিয়া হাসিল, বলিল, 'ওর নাম ঝুমঝুম। আর আমার নাম—অনিন্দ্যা।'

বিমান অতিমাত্রায় উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ঝুমঝুম! ভারি চমৎ—! অর্থাৎ কিনা অনিন্দ্যা। ভারি চমৎকার নাম তো—'

'কোন্ নামটা চমৎকার?'

বিমান ভীষণ লজ্জিত হইয়া পড়িল, তাহার কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া ঝুমঝুমকে আদর করিতে করিতে তোতলার মতো অর্ধবিভক্ত ভাষায় বলিল, 'অ্যা—দ্ দ্ দ্— মানে দ্-দুটো নামই চমৎকার—'

অনিন্দ্যা স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চল্ ঝুমঝুম, বাড়ি যাই।—নমস্কার।'

হিরণ্ময়ী শাললতার মতো জঙ্গমা, স্ফুট-বিকশিত-যৌবনা অনিন্দ্যা চলিয়া গেল; ঝুমঝুম তাহার চারিপাশে একটি কালো প্রজাপতির মতো নৃত্য করিতে করিতে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, বিমান বেঞ্চিতে বসিয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

পরদিন—আবার সেই দৃশ্য। আবার সেই ধরনের কথাবার্তা। অনিন্দ্যার গাল মৃদু কৌতুকে টোল খাইয়া যায়, টুকটুকে ঠোঁট দুটি বিভক্ত হইয়া দাঁতগুলিকে ঈষৎ ব্যক্ত করে; বিমান ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠে—অপরিচিতা তরুণীর সহিত রসালাপ করা তাহার অভ্যাস নাই; ঝুমঝুম দুজনকে ঘিরিয়া খেলা করে, বিমানের হাত চাটিয়া দেয়।

এইভাবে আরো কয়েকদিন কাটিল। বিমান ও অনিন্দ্যার মধ্যে বেশ ভাব হইয়াছে—বিমান আর ততটা সংকোচ করে না। বরং একটা অপূর্ব মোহ দিবারাত্র তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিমান চরিত্রবান যুবা, কিন্তু তাহার ভয় হইতেছে চরিত্র বুঝি আর থাকে না। এদিকে অনিন্দ্যার মিশমিশে কালো চোখে কিসের রং ধরিয়াছে। সমস্ত দিনটা যেন সন্ধ্যার প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া যায়। সন্ধ্যায় পার্কে বেড়াইতে যাইবার পূর্বে প্রকাণ্ড আয়নার সম্মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজেকে দেখে, একখানা কাপড় ছাড়িয়া আর একখানা পরে, কানের দুল খুলিয়া ঝুমকা পরে, ঝুমকা খুলিয়া কানবালা পরে—

একদিন অনিন্দ্যা বলিল, 'আপনি তো প্রথম দিনই আমার নামটা জেনে নিলেন। নিজের নাম বলেন না কেন?'

ঝুমঝুমকে কোলে লইয়া বিমান বসিয়াছিল, চমকিয়া বলিল, 'আমার নাম বি—বিভূতি মিত্র।'

'কলেজে পড়েন বুঝি?'

আবার চমকিয়া বিমান বলিল, 'হ্যাঁ—পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট।'

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—আজকাল রোজই বাড়ি ফিরিতে দেরি হইয়া যায়। জনহীন পার্ক একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। আকাশে চাঁদ নাই। অনিন্দ্যা বিমানের পাশে একটু ঘেঁষিয়া বসিল। হাঁটুতে হাঁটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়া গেল।

দুজনে কিছুক্ষণ নীরব। তারপর বিমান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

অনিন্দ্যা বলিল, 'নিশ্বাস ফেললেন যে?'

বিমান অবরুদ্ধ আবেগের প্রাবল্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভুল আবৃত্তি করিল—

'—যাহা পাই তাহা ভুল করে পাই
যাহা চাই তাহা পাই না।'

আবার কিছুক্ষণ নীরব। পূর্বাকাশ ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে—চাঁদ উঠিবে। অনিন্দ্যা অস্ফুট আধ-বিজড়িত স্বরে বলিল, 'আপনি কখনও ভালোবেসেছেন?'

আকস্মিক উত্তেজনার ফলে মানুষের বাহ্য অভিব্যক্তি কখনও কখনও উৎকট আকার ধারণ করে। বিমান সহসা ঘুমন্ত ঝুমঝুমকে দু'হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রজ্জ্বলিত চক্ষে অনিন্দ্যার পানে চাহিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'এ পৃথিবীতে টাকা না থাকলে কাম্য বস্তু লাভ করা যায় না। আমার টাকা নেই। কেন মিছে আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন?'—বলিয়া ঝুমঝুমকে অনিন্দ্যার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

রাত্রে ঘুমাইয়া বিমান স্বপ্ন দেখিল—কালো কোঁকড়া চুল, মিশমিশে দুটি চোখ, লাল টুকটুকে—

ঘুম ভাঙিয়া গেল। উত্তপ্ত মস্তকে জল দিয়া সে আবার ঘুমাইল। আবার স্বপ্ন দেখিল—

সকালে উঠিয়া বিমান উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভাবিল,—আর তো পারা যায় না। লোভ সংবরণ করা বড় কঠিন, চরিত্র তো রসাতলে গিয়াছেই মনের অগোচর পাপ নাই—তবে আর বাহিরে সাধু সাজিয়া লাভ কি? যাহা হইবার হোক্—আজই, হাঁ, আজই সে এই কার্য করিবে। সন্ধ্যার পর পার্কে কেহ থাকে না—সেই সময়—

কামনার বিষে যখন অন্তর জর্জরিত, তখন অতি বড় সাধু ব্যক্তিরও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ঘৃত ও অগ্নির সান্নিধ্য অতি ভয়ংকর। কত সচ্চরিত্র যুবা—। কিন্তু যাক্, শেষের দিকে আর হিতোপদেশ দিব না।

সন্ধ্যার পর আবার দুজনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। অনিন্দ্যার চুলের সৌরভ বিমানের নাকে আসিতেছে। এক রাশ নরম রেশমের মতো রুমঝুম তাহার কোলে ঘুমাইতেছে।

পার্ক অন্ধকার, জনমানব নাই। অনিন্দ্যা কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল আমার কথার জবাব না দিয়ে চলে গেলেন যে?'

অন্ধকারে হাতে হাত ঠেকিল, বিমান তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'জবাব কি বুঝতে পারো নি?'

'না, বলুন না শুনি।' বিমানের তপ্ত মুঠির মধ্যে অনিন্দ্যার হাতখানি যেন মাখনের মতো গলিয়া গেল।

'অনিন্দ্যা, তোমাকে আমার মনের কথা বুঝিয়ে দেব। কিন্তু তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে?'

'হয় তো পারি, শুনিই না আগে।'

'তবে তুমি একটু ব'সো। আমি এখনই আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'রুমঝুমের বোধ হয় তেষ্টা পেয়েছে, ওকে একটু জল খাইয়ে আনি।'

বিমান চলিয়া গেল। তারপর পনের মিনিট—আধ ঘণ্টা—একটি কম্প্রবক্ষা তরুণী অন্ধকার পার্কে একাকিনী প্রতীক্ষা করিতেছে! কোথায় গেল বিমান?

বিমান তখন শহরের অন্য প্রান্তে নিজের ঘরে বিছানার উপর শুইয়া রুমঝুমকে চটকাইতেছে, 'রুমঝুম, তোকে আমি চুরি করে এনেছি! তোর মন কেমন করবে না? ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না? আর কখনো আমরা পার্কের ত্রিসীমানায় যাব না। কি বলিস? অনিন্দ্যা নিশ্চয় খুব রাগ করবে;—কিন্তু তোকে ছেড়ে যে আমি এক দণ্ডও থাকতে পারছিলুম না!'

প্রেমের কথা

পৃথিবীতে যেদিকে দৃষ্টি ফিরাই, দেখি নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ কেবল অহরহ প্রেম করিতেছে। আশ্চর্য ব্যাপার!—বাংলাদেশেরও নিস্তার নাই; যুবক-যুবতীদের মধ্যে নিরন্তর প্রেম চলিতেছে—ট্রামে, বাসে, কলেজে প্রেম জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই প্রেম দীর্ঘজীবী নয়, অধিকাংশই আঁতুড় ঘরে পেঁচোয় পাইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতেছে। তবু বিরাম নাই। প্রেমের জন্মনিরোধ করিবার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কেহ আবিষ্কার করিতে পারিল না।

কিন্তু তবু নিয়ম মাত্রেরই ব্যতিক্রম আছে। কলিকাতা শহরেই এইরূপ দুইটি ব্যতিক্রম বাস করিতেছিল। হঠাৎ এক চিত্র-প্রদর্শনীতে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। বলা বাহুল্য, ব্যতিক্রম দুটির একটি যুবক, অপরটি যুবতী।

প্রাচ্যকলার প্রদর্শনী। সুতরাং কলার সঙ্গে সঙ্গে বেল, তাল, নারিকেল, এমন কি কাঁঠাল পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদর্শিত হইতেছিল।

যুবতীটি এইরূপ একটি ফলভারপীড়িত চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, যুবক ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ছবির নাম—প্রেমালসা! যুবতী সেইদিকে ঘৃণাপূর্ণ তর্জনী নির্দেশ করিয়া কহিল, 'কী কুৎসিত!'

যুবক বলিল, 'বীভৎস।'

এই প্রথম আলাপ।

উভয়েরই উভয়ের কথা ভালো লাগিল। যুবক যুবতীর দিকে

ফিরিয়া বলিল, 'নরকের চিত্র কি প্রেমের চিত্রের চেয়েও বীভৎস? সম্ভব নয়··· আপনার নাম কি?'

যুবতী বলিল, 'কখনই না।······আমার নাম কলিকা।'

'কলিকা! কিসের—গাঁজার?'

'তা হ'লেও দুঃখ ছিল না।—আপনার নাম কি?'

'হুতাশন।'

'বেশ হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় গাঢ় হওয়া কর্তব্য।'

'আমি কিন্তু প্রেম মানি না।'

'আমিও না।'

'বেশ, তবে চলুন—চা খাওয়া যাক্।'

উভয়ের মধ্যে পরিচয় গাঢ় হইল।

হুতাশন একদিন বলিল, 'দেখ কলিকা, এ জগতে প্রেমই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল, যে প্রেম করেছে সেই মরেছে। সংসারে বিবাহের একটা রীতি আছে—কিন্তু সে কি জন্যে? প্রেমের জন্যে নয়, কম খরচে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার জন্যে। যারা বিয়ে করে, তারা সেই কথাটা ভুলে গিয়ে প্রথমেই বৌয়ের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করে দেয়। ন্যক্কারজনক কাণ্ড! আমি ব্যয়-সংক্ষেপের জন্যে বিবাহ বরদাস্ত করতে রাজি আছি, কিন্তু প্রেম আমার অসহ্য।'

কলিকা বলিল, 'আমারও। আচ্ছা, প্রেম যদি না থাকত পৃথিবীটা কি সুন্দর জায়গা হ'ত বলুন দেখি!'

'চমৎকার। ঠিক গার্ডেন অফ্ ইডেনের মতো। কাপড়-চোপড় কিছু দরকার হ'ত না, খরচ অনেক কম হ'ত। কিন্তু প্রেমরূপী কালসর্প ঢুকেই সব মাটি করে দিয়েছে। সাবধান, এই কালসর্পের কুহকে ভুলে যেন আপেল খেয়ে ফেলো না।'

'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—আচ্ছা, আপনি তো অনেক খবর রাখেন, প্রেমের লক্ষণ কি—বলুন তো?'

হুতাশন ভাবিয়া বলিল, 'প্রেমের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বিরহ। অর্থাৎ বেশিক্ষণ দেখতে না পেলে দেখতে ইচ্ছে করে, মন ছটফট করে—এইটেই সবচেয়ে গুরুতর লক্ষণ।'

'আর?'

'আর—নিজের ক্ষতি করে তার ভালো করবার চেষ্টা। - যেমন ধরো, তুমি বই পড়তে ভালোবাসো – কেউ যদি নিজের সিগারেটের পয়সা কেটে তোমাকে বই কিনে দেয়—বুঝবে সে তোমার প্রেমে পড়েছে—'

'বুঝেছি। আমি বই পড়তে ভালোবাসি, কিন্তু বাড়্তি পয়সার অভাবে কেনা হয় না। কেউ উপহারও দেয় না।'

'সেটা তোমার সৌভাগ্য। জগতে পয়সার বড় অভাব—আমার বাড়তি পয়সা নেই, তোমারও নেই।—এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

অতঃপর পুরা এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হুতাশন ও কলিকা পরস্পরের প্রেমে পড়ে নাই—যদিও পড়িলে কেহই বিস্মিত হইত না। তাহারা একই বাড়িতে বাস করিতেছে, পাশাপাশি ঘরে শয়ন করিতেছে—এবং তাহাদের হাঁড়িও অভিন্ন। এরূপ অপূর্ব ব্যাপার বাংলাদেশে আর কখনও ঘটে নাই।

কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। হুতাশন সাধারণতঃ বেলা চারটের সময় কর্মস্থান হইতে ফিরিত; একদিন সাড়ে পাঁচটার সময় সে চোরের মতো চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকিল। তাহার বগলে একটি প্যাকেট।

বাড়ি ঢুকিতেই কলিকা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, 'এত দেরি করলে কেন? উঃ—ভেবে ভেবে আমি'—বলিয়া সহসা তাহার হাত ছাড়িয়া দিল।

হুতাশন ভগ্নস্বরে বলিল, 'কলিকা, সর্বনাশ হয়েছে!'

শঙ্কিত কণ্ঠে কলিকা বলিল, কি হয়েছে?'

'আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এই দেখ—সিগারেটের পয়সা খরচ করে তোমার জন্যে বই কিনেছি।—এখন উপায়!'—হুতাশন চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কলিকার মুখেও বিষণ্ণতার ছায়া পড়িল, সে বিমনা হইয়া হুতাশনের কাঁধের উপর হাত রাখিল; অন্যমনস্কভাবে হাত দুটি হুতাশনের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। কলিকা বলিল, 'আমিও—আমিও বোধ হয় তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

চমকাইয়া হুতাশন তাহাকে নিজের কোলের কাছে টানিয়া আনিল, উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, 'তাই নাকি। কি করে জানলে?'

কলিকা তাহার কোলের উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'বিরহ। তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছিল—তাই—'

দু'জনেই গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

হুতাশন বলিল, 'কলি, পাছে প্রেমে পড়ি এই ভয়ে গোড়াতেই তোমাকে বিয়ে করেছিলুম—কিন্তু সব ফস্কে গেল। যে বইটা এনেছি, তার নাম কি জানো? চুম্বন।—এসো।'

হুতাশন ও কলিকার মাঝখানে প্রেমরূপী গল্পিকার উদ্ভব হইয়া ব্যাপারটাকে অকস্মাৎ অত্যন্ত মাদকতাপূর্ণ করিয়া তুলিল।

বনমানুষ

আদা বাঁড়ুয্যের কন্যা নেড়ীকে লইয়া কাঁচকলা গাঙ্গুলীর পুত্র বদাই অন্তর্হিত হইবার পর শহরে যে ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে বাঁড়ুয্যে শনিবার রাত্রির ট্রেনে বর্ধমান গিয়া চুপি চুপি মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া আসিয়াছেন। পনরো-শত টাকাও বদাইয়ের হস্তগত হইয়াছে।

বদাই যে নেড়ীকে বিবাহ করিয়াছে, একথাটাও কেমন করিয়া শহরে জানাজানি হইয়া গিয়াছে। বাঁড়ুয্যেকে এ বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি সক্রোধে হাত-মুখ নাড়িয়া বলেন,—'আমার মেয়ে নেই, মরে গেছে।' মনে মনে বলেন—ষাট্! ষাট্!

গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—'বদাইকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছি। হোক একমাত্র ছেলে। তবু ওর মুখ দেখব না।'

ডাক-গাড়ির ডাকাতির অবশ্য কিনারা হয় নাই।

২

গভীর রাত্রে বাঁড়ুয্যের সদর দরজা ভেজানো ছিল, গাঙ্গুলী নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন।

বাঁড়ুয্যে তক্তাপোশে বসিয়া হুঁকা টানিতেছিলেন, হুঁকাটি বেহাইয়ের হাতে দিলেন। গাঙ্গুলী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তারপর বেহাই, কেমন দেখলে?'

বাঁড়ুয্যের ভগ্নদন্ত মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি মুখ চোখাইয়া বলিলেন,—'দিব্যি মানিয়েছে ছোঁড়া-ছুঁড়িকে—ঠিক যেন হর-পার্বতী।'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'আমারও দেখবার জন্যে মনটা হাঁচোড়-পাঁচোড় করছে—'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—'এখন নয়। এখন তুমি দোকান বন্ধ করলে লোকের সন্দেহ হতে পারে। আর দু'দিন যাক।'

'হুঁ'—গাঙ্গুলী হুঁকায় অধর সংযোগ করিয়া টান দিলেন—'আর কিছু খবর আছে না কি?'

'খবর আর কি! তবে দেড় হাজার টাকায় কুলাবে না। জাঁকিয়ে দোকান করতে হলে আরও হাজার দুই টাকা চাই। তা ছাড়া সংসার খরচও আছে, বলতে নেই ওরা এখন সংসারী হল।—'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'তা তো বুঝছি; কিন্তু দু'হাজার টাকা পাই কোথায়? তুমি একটা মতলব বার কর না দাদা।' বলিয়া হুঁকাটি আবার বাঁড়ুয্যের হাতে ধরাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়া বাঁড়ুয্যে মুখ তুললেন—'শহরে একটা সার্কাশ এসেছে না?'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'হাঁ শহরের ছোঁড়ারা মেতে উঠেছে। দু'টো বাঘ, তিনটে সাইকেল-চড়া মেয়ে, একটা বনমানুষ—'

'বনমানুষ?'

'হ্যাঁ, প্রকাণ্ড বনমানুষ। দেখলে ভয় করে।'

বাঁড়ুয্যে আবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে লাগিলেন।

৩

সার্কাসের দল ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের একপাশে তাঁবু ফেলিয়াছে। তাঁবুর পিছনে জন্তু-জানোয়ারের আস্তানা। একটি ক্যাঙারু, কয়েকটি বানর, দু'টি লোম-ওঠা বাঘ এবং একটি বনমানুষ।

বনমানুষটিই আসল দ্রষ্টব্য জীব। ভয়ঙ্কর চেহারা, মানুষের সহিত সাদৃশ্যই যেন তাহার চেহারাটাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

জন্তু-জানোয়ার দেখিবার জন্য ছেলেদের ভিড় তো অষ্টপ্রহর লাগিয়াই থাকে, বুড়োরাও বাদ যান না। আদা বাঁড়ুয্যে সকালে আপিস যাওয়ার মুখে একবার উঁকি মারিয়া যান। বনমানুষের খাঁচার মধ্যে দুই-চারিটা ছোলাভাজা ফেলিয়া দেন। ছোকরাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন,—'নাম যদিও বনমানুষ, তবু শহরেই থাকে এরা। মানুষের পূর্বপুরুষ—হুঃ! পূর্বপুরুষ হতে যাবে কোন্ দুঃখে? মাসতুত ভাই। চেহারার আদল দেখে চিনতে পারছ না?'

ছেলেরা শ্লেষ উপভোগ করে। বনমানুষ ছোলাভাজা খুঁটিয়া খাইতে খাইতে গভীর ভ্রূকুটি করিয়া তাকায়।

অপরাহ্নে আসেন কাঁচকলা গাঙ্গুলী। ক্যাঙারুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছেলেদের ডাকেন,—'ওহে দ্যাখো দ্যাখো, ভাবছ এটা ক্যাঙারু, অস্ট্রেলিয়ার জন্তু? মোটেই তা নয়। আমার পাশের বাড়িতে থাকতো, সার্কাসওয়ালারা ধরে এনে রেখেছে।'

সার্কাস বেশ চলিতেছে, ছেলে-বুড়ো সকলেই খুশী। তারপর হঠাৎ একদা রাত্রিকালে এক ব্যাপার ঘটিল। বনমানুষ খাঁচার তালা ভাঙিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

৪

পরদিন সকালবেলা গাঙ্গুলীর দোকানের সামনে আড্ডা জমিয়াছিল। বনমানুষ পালানোর গল্পই হইতেছিল; বনমানুষটা একেবারে নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে, কোথাও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।

বনমানুষ নিশ্চয়ই বনে গিয়াছে, আলোচনা এই পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে,

এমন সময় পণ্টু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আড্ডাধারীদের মাঝখানে বসিয়া পড়িল।

সবাই প্রশ্ন করিল,—'কি রে! কি রে পণ্টু, কি হয়েছে?'

পণ্টু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—'বনমানুষ!'

'কোথায়! কোথায়! তুই দেখেছিস্?'

পণ্টুর বয়স পনরো-ষোল, একটু হ্যালা-ক্যাবলা গোছের। সে বলিল, -'আমার ময়নার জন্যে ফড়িং ধরতে বনের ধারে গিয়েছিলুম। ওরে বাবা, হঠাৎ আওয়াজ হ'ল—গাঁক! ওরে বাবা, ছুট্টে পালিয়ে আসছিলুম, একটা কুলগাছের ঝোপের আড়াল থেকে বনমানুষটা আমাকে খিম্‌চে নিলে। এই ছাখো।'

সকলে দেখিল পণ্টুর নিতম্বের কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং ভিতরে চামড়ার উপর কয়েকটি রক্তমুখী আঁচড়ের দাগ রহিয়াছে। আঁচড়গুলি বনমানুষের নখের আঁচড় হইতে পারে, আবার কুলকাঁটার আঁচড় হওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিবার মত মনের অবস্থা কাহারও ছিল না, দেখিতে দেখিতে গাঙ্গুলীর দোকান শূন্য হইয়া গেল। গাঙ্গুলীও অসময়ে দোকান বন্ধ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অল্পকাল মধ্যে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বনমানুষ পণ্টুকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া এমন অবস্থা করিয়াছে যে, পণ্টুর প্রাণের আশা নাই। দিনে-দুপুরে শহর থম্‌থমে হইয়া গেল; রাস্তায় লোক চলাচল নাই, দোকানপাট বন্ধ। যাহাদের নিতান্তই কাজের দায়ে পথে বাহির হইতে হইয়াছে, তাহারা লাঠিসোঁটা লইয়া ভয়চকিতনেত্রে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে। যাহাদের ঘরে বন্দুক আছে, তাহারা দ্বার বন্ধ করিয়া বন্দুকে তেল মাখাইতে লাগিল।

৫

সার্কাস ম্যানেজারের থানায় তলব হইয়াছে, দারোগা তাঁহাকে ধমকাইতেছেন—'আপনার দোষ, বনমানুষ পালায় কেন? মনে রাখবেন, যদি কারুর অনিষ্ট হয়, আপনার হাতে হাতকড়া পড়বে।'

সার্কাস ম্যানেজার মিনতি করিয়া বলিলেন,—'হুজুর, আমার রামকানাই নিরীহ ভালমানুষ, মুখ তুলে কারুর পানে তাকায় না—'

'রামকানাই কে?'

'আজ্ঞে আমার বনমানুষের নাম রামকানাই।'

'বটে! খাসা রামকানাই আপনার। খবর পেলাম, পণ্টু বলে একটি স্কুলের ছেলেকে কামড়ে দিয়েছে।'

'আজ্ঞে হতেই পারে না। রামকানাই বেহদ্দ ভীতু। স্কুলের ছেলে দেখলেই কেঁদে ফ্যালে। ওরা ওকে ভারি বিরক্ত করে কিনা।'

'তা সে যাই হোক, চারিদিকে তল্লাশ করুন। হয়তো বনের মধ্যে ঢুকেছে। আজই ধরা চাই।'

সার্কাস ম্যানেজার নিজের দলবল লইয়া জঙ্গল তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু রামকানাইকে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় ম্যানেজার ঢেঁট্রা পিটাইয়া পুরস্কার ঘোষণা করিলেন—যে কেহ রামকানাইয়ের খবর আনিতে পারিবে, সে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইবে।

সকলে বন্ধ দ্বারের আড়াল হইতে ঢেঁট্রা শুনিল, কিন্তু এই ভর সন্ধ্যাবেলা পঞ্চাশ টাকার লোভেও কেহ ঘর হইতে বাহির হইল না।

রামকানাই তখন আদা বাঁড়ুয্যের বাড়ির পিছনদিকে একটা এঁদোপড়া ঘরের মধ্যে বসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত চিনাবাদাম ভাজা খাইতেছিল।

৬

মিহিলাল নামক এক হিন্দুস্থানী স্যাকরা বাজারে দোকান করিত। সামান্য দোকান, রূপার কাজই বেশি। কিন্তু নিশুতি রাত্রে তাহার কাছে লোক আসিত, সোনার গহনা নামমাত্র দামে বিক্রয় করিয়া যাইত; মিহিলাল তৎক্ষণাৎ গহনা গলাইয়া সোনা করিয়া ফেলিত।

সে-রাত্রে মিহিলাল দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। খিড়্‌কির দরজায় খুট্‌খুট্‌ শব্দ শুনিয়া ঘুম-চোখে উঠিয়া দরজা খুলিল। তারপর 'বাপ রে!' বলিয়া একটি চীৎকার ছাড়িয়া সদর দরজা খুলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। খিড়্‌কির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ছিল বিপুলকায় রামকানাই। রামকানাইয়ের পিছনে কেহ ছিল না তাহা মিহিলাল দেখিবার অবসর পাইল না।

সকাল হইলে মিহিলাল কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিল। দেখিল বনমানুষ তাহার দোকান তচনচ করিয়া গিয়াছে; বিশেষত যে-ঘরে তাহার রান্নার হাঁড়িকুঁড়ি থাকিত সে ঘরের অবস্থা শোচনীয়। একটিও হাঁড়ি আস্ত নাই, চাল ডাল তেল ঘি আনাজ চারিদিকে ছড়ানো। তাহার মাঝে মাঝে বনমানুষের পায়ের দাগ।

একটি হাঁড়িতে মসুর ডালের নিচে ষাট্‌ ভরি সোনা লুকানো ছিল, সোনা নাই।—

মিহিলাল পুলিসে খবর দিল না। চোরের মায়ের কান্না কেহ শুনিতে পায় না। ব্যথিত চিত্তে ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল—এ কি তাজ্জব ব্যাপার! বনমানুষও সোনা চেনে!

আশেপাশের দোকানদারেরা অবশ্য জানিতে পারিল, কাল রাত্রে মিহিলালের দোকানে বনমানুষ আসিয়াছিল; কিন্তু সোনার কথা কেহ জানিল না। মিহিলাল কিল খাইয়া বেবাক কিল চুরি করিল।

৭

সার্কাস ম্যানেজার পুরস্কারের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। যে-ব্যক্তি রামকানাইয়ের সন্ধান দিতে পারিবে সে একশত টাকা পুরস্কার পাইবে। কিন্তু তবু রামকানাইকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ব্যগ্রতা কাহারও দেখা গেল না। মিহিলালের দোকানের খবরটা পল্লবিত হইয়া শহরে রাষ্ট্র হইয়াছিল। মিহিলাল আর বাঁচিয়া নাই, বনমানুষ তাহার ঘাড় মট্‌কাইয়াছে।

বিকাল বেলা সার্কাস ম্যানেজার থানায় বসিয়া দারোগার ধমক খাইতেছিলেন এবং কাঁদো কাঁদো মুখে রামকানাইয়ের ধর্মনিষ্ঠ চরিত্রের গুণগান করিতেছিলেন এমন সময় কাঁচকলা গাঙ্গুলী হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন—'দারোগাবাবু, বনমানুষের খবর পেয়েছি।'

ম্যানেজার লাফাইয়া উঠিলেন—'কৈ—কোথায়?'

গাঙ্গুলী একবার ম্যানেজারের দিকে চোখ ফিরাইয়া দারোগাকে বলিলেন,—'একশো টাকা পুরস্কার দেবার কথা পাবো তো?'

ম্যানেজার একশত টাকার নোট পকেট হইতে বাহির করিয়া দারোগার সম্মুখে রাখিলেন—'হুজুর, এই টাকা আপনার কাছে জমা রহিল, যদি রামকানাইকে পাওয়া যায় আপনিই এঁকে পুরস্কার দেবেন।'

দারোগা বলিলেন,—'বেশ। গাঙ্গুলীমশায়, বনমানুষ কোথায় দেখলেন?'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'আজ্ঞে বনের মধ্যে। আমার বাড়ির ছাদের

ওপর থেকে দূরবীণ লাগিয়ে দেখলাম একটা গাছের তলায় কম্বলের মত পড়ে আছে। ভাল করে দেখি—বনমানুষ!'

ম্যানেজার বলিলেন,—'চলুন চলুন। আহা আমার রামকানাই দু'দিন না খেয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছে—'

দলবল সহ ম্যানেজার জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। নির্দিষ্ট গাছের উদ্গত শিকড়ে মাথা রাখিয়া রামকানাই নিদ্রাগত। তাহার নাক ডাকিতেছে।

আফিমের মাত্রা বোধহয় একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অনেক ঠেলাঠেলির পর রামকানাইয়ের ঘুম ভাঙিল। সে উঠিয়া হাই তুলিল, আঙুল মট্‌কাইল, তারপর ম্যানেজারের গলা জড়াইয়া মুখ চুম্বন করিল।

৮

নৈশ বৈবাহিক-সম্মেলনে কাঁচকলা গাঙ্গুলী বলিলেন,—'কেমন হল বেহাই?'

আদা বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'খাসা হল। শাককে শাক তলায় মুলো। পুরস্কারের টাকাটা উপরি।'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'এবার তাহলে বেরিয়ে পড়ি। বদাই আর নেড়ীকে দেখবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করছে। এখন গেলে কেউ সন্দেহ করবে না, ভাববে পুরস্কারের টাকায় কলকাতায় ফুর্তি করতে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ। এবার দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়। সোনা সঙ্গে নিয়ে যেও।'

'নিশ্চয়। আচ্ছা বেহাই, মিহিলালের দোকানে যে সোনার তাল আছে এটা বুঝলে কি করে?'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—'শিকারী বেড়াল গোঁফ দেখলে চেনা যায়।

মিহিলালের ওপর অনেকদিন থেকে নজর ছিল। ওর ঘরে বৌ আছে কিন্তু রাত্রে দোকানে শোয়। ব্যাটা ডুবে ডুবে জল খায়, বাইরে ছোট্ট দোকান করে রেখেছে, ভেতরে ভেতরে চোরাই মালের কারবার চালায়। ব্যাটা হর্তেল ঘুঘু।'

গাঙ্গুলী হাসিলেন,—তা ভালই হল, চুরির ধন বাটপাড়িতে গেল।'

আদা বাঁড়ুয্যেও কাঁচকলা গাঙ্গুলীর চোখে চোখ তুলিয়া মৃদুমন্দ হাসিলেন।

বরলাভ

প্রৌঢ় সদরালা সারদাবাবু গভীর রাত্রে দেবীর বরলাভ করিলেন।

দেবীর চেহারাটি ঠিক ঠাকুর-দেবতার মতো নয়, তন্বী তরুণী কুহকিনীর মতো। ফিক্ করিয়া হাসিয়া দেবী বলিলেন, 'বৎস চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলাম, কাল রাত্রেও যদি তোমার মনোভাব পূর্ববৎ থাকে, বর পাকা করিয়া দিব।'—বলিয়া চটুল হাস্যময়ী দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

ব্যাপারটা এই শৈশবকাল হইতে সারদাবাবু ধর্মভীরু লোক। তাই ওকালতি হইতে মুন্সেফি এবং মুন্সেফি হইতে সদরালা পদবীতে উত্তীর্ণ হইয়াও তাঁহার ধর্মভীরুতা দূর হয় নাই। সুবিচার করিবার দুরন্ত বাসনা সর্বদাই তাঁহার অন্তরে জাগিয়া থাকিত। অথচ আদালতের সকল সাক্ষী এবং উকিলই যে ঘোর মিথ্যাবাদী এ-বিষয়েও তাঁহার মনে সংশয় ছিল না। তিনি ব্যথিতচিত্তে ভাবিতেন—আহা, মানুষের মুখ দেখিয়া যদি তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিতাম।

বুঝিবার চেষ্টাও তিনি বিলক্ষণ করিতেন। ফলে তাঁহার অধিকাংশ রায় আপীলে উল্টাইয়া যাইত। কিন্তু দীর্ঘকালের একান্ত বাসনা কখনও নিষ্ফল হয় না। নিদ্রাযোগে সারদাবাবু হঠাৎ দেবীর বরলাভ করিলেন।

সেদিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে তাঁহার বিলম্ব হইল; ঘুম ভাঙিতে দেখিলেন, বাড়ির ঝি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে টিপয়ের উপর চায়ের পেয়ালা রাখিতেছে। ঝিটি অনুত্তীর্ণযৌবনা বিধবা; সারদাবাবু চোখ মেলিয়া তাহার পানে চাহিতেই শুনিতে পাইলেন, সে বলিতেছে, 'বুড়ো মড়ার লজ্জাও নেই, তিন পহর বেলা অবধি খাটে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মরণ আর কি!'

সারদাবাবু এই ঝিটিকে অত্যন্ত স্নিগ্ধভাষিণী ও নম্রপ্রকৃতির বলিয়া জানিতেন, তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তার পর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ! কি বললে?'

ঝি বলিল, 'কিছু তো বলিনি বাবু, চা এনেছি।' মিষ্ট হাসিয়া ঝি প্রস্থান করিল। সারদাবাবু ব্যাদিত মুখে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সংশয়াকুলচিত্তে চা পান করিতে করিতে তাঁহার স্মরণ হইল, রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সারদাবাবুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

সারদাবাবুর সংসারে প্রথম পক্ষের একটি কন্যা ও দ্বিতীয় পক্ষের একটি পত্নী থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল। তিনি জানিতেন, ইহারা দু'জনে সর্বদা তাঁহার আদেশ, এমন কি ক্ষীণতম বাসনাটি পর্যন্ত মানিয়া চলে। স্বাধীন ইচ্ছা তাহাদের নাই, স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে গেলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিতেন। ফলে, একটিমাত্র কর্তার দ্বারা শাসিত হইয়া সংসার-তন্ত্র হিট্‌লারের জার্মেনি বা মুসোলিনীর ইটালীর মতো নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছিল।

যা হোক্, সারদাবাবু নিজের আপিস-ঘরে গিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। মনটা আশা-আশঙ্কার মাঝখানে দোল খাইতে লাগিল।

একটি তরুণবয়স্ক মুন্সেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল, সে প্রায়ই আসে; প্রবীণ হাকিমের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ, বড ভালো ছেলে। সারদাবাবু হৃষ্টচিত্তে তাহাকে হাকিমের কর্তব্য সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিয়া থাকেন।

মুন্সেব আসিতেই তিনি সহাস্যে কলম রাখিয়া বলিলেন, 'এসো হে সুবোধ। একটা রায় লিখেছি, তোমার দেখা উচিত। অনেক শিখতে পারবে।'

সুবোধ বিনীতভাবে বলিল, 'আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো সকালবেলা এসেছি। দিন।'

সারদাবাবু রায় দিতে দিতে শুনিতে পাইলেন, সুবোধ বলিতেছে, 'কচু রায় লিখেছ। পেটে বোমা মারলে তো এক লাইন নির্ভুল ইংরেজি বেরোয় না!'

অভিভূত সারদাবাবু শুনিতে লাগিলেন, গভীর মনঃসংযোগে তাঁহার রায় পড়িতে পড়িতে সুবোধ বলিতেছে, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, রায়ের মধ্যে আবার রসিকতা হয়েছে! দ্বিতীয় পক্ষ কি না, রস একেবারে উথলে পড়ছে! বেশি দূর যেতে হবে না, জজ্-সাহেবই রায়ের পিণ্ডি চটকে ছেড়ে দেবে।...চমৎকার। এখানটা কী পাওয়ারফুল্ আর্গুমেণ্ট!...মেয়েটা তো আজ এখনও আসছে না! রোজই ছল-ছুতো করে ঘরে ঢুকে পড়ে, আর আমাকে দেখেই জিব কেটে পালায়,—যেন কতই লজ্জা! হুঁ হুঁ, শিকারী মেয়ে!... বুড়ো কিন্তু আচ্ছা বেরসিক; নিজে দ্বিতীয় পক্ষ নিয়ে ফুর্তিতে আছে, এদিকে মেয়ের যে বুক ফাটছে সেদিকে নজর নেই। আমার সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস্ করে দিলেও তো পারে...'

সারদাবাবু শিহরিয়া কানে আঙুল দিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না, সুবোধের স্বগতোক্তি তাঁহার কানে পৌছিতে লাগিল। তিনি তখন ঘাড় গুঁজিয়া প্রবল বেগে রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

যথাসময়ে মেয়ে চুলের বিনুনি খুলিতে খুলিতে ঘরে প্রবেশপূর্বক সুবোধকে দেখিয়া জিব কাটিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। সারদাবাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

সেদিন আহারে বসিয়া সারদাবাবু করুণনয়নে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিলেন। স্ত্রী বলিলেন, 'হ্যাঁ গা, আজ কি শরীর ভালো নেই? মুখখানা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে! আজ না হয় কোর্টে গিয়ে কাজ নেই।'—বলিয়া উদ্বিগ্নমুখে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। সারদাবাবু স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিলেন, 'জজ্-সাহেব নিশ্চয় হুড়ো দিয়েছে, তাই মন খারাপ। ভালোই হয়েছে—বাইরে গুঁতো না খেলে পুরুষমানুষ ঘরের লোকের কথায় কান দেয় না। আজই সন্ধ্যেবেলা মাইসোর জর্জেট্ শাড়ির কথাটা তুলব। সোজাসুজি তুললে হবে না. তা হ'লেই উল্টো রাস্তা ধরবে। ছেঁড়া কাপড়খানা প'রে সামনে ঘোবাঘুরি করব, চোখে পড়লেই জিগ্যেস করবে। তখন বেশ গুছিয়ে কথাটা পাড়তে হবে। সত্যি বাপু, তুমিই না হয় বুড়ো, তাই বলে আমার কি সাধ-আহ্লাদ নেই। পঁচিশ বছর বয়সে কি কেবল মালা-জপই করব? দোজপক্ষে না পড়ে যদি…'

নীরবে আহার সমাপ্ত করিয়া সারদাবাবু কোর্টে গেলেন।

এজলাসে বসিয়া সারদাবাবু উৎসুকভাবে চারিদিকে চাহিলেন। গৃহে যদিচ কয়েকটা প্রবল ধাক্কা খাইয়াছেন, তবু তিনি একেবারে দমিয়া যান নাই।

এজলাসে তাঁহার পেশকার ও কয়েক জন উকিল উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া সারদাবাবু এক অপূর্ব কলরব শুনিতে পাইলেন। সকলেই একসঙ্গে কথা কহিতেছে, অন্যের কথা শুনিবার ধৈর্য কাহারও নাই। এই সম্মিলিত অনৈক্যতানের ভিতর হইতে একটি শব্দ কেবল অনাহত-ধ্বনির মতো উত্থিত হইতেছে—টাকা! টাকা! টাকা!

সারদাবাবু কড়া হাকিম, এজলাসে কোলাহল সহ্য করিতে পারেন না, তিনি পরুষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'সাইলেন্স!'

সকলে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কেহই তো কোনও কথা বলে নাই!

নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সারদাবাবু সংকুচিতভাবে অধোবদন হইলেন; অমনি কোলাহল থামিয়া গেল। তিনি তখন পেশকারের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, 'কি কাজ আছে দেখি!'

এক জন উকিল একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়া বলিলেন, 'হুজুর, আমার মক্কেল পীড়িত, এক হপ্তার মুলতুবি প্রার্থনা করি।'

সারদাবাবু বলিলেন, 'ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ আছে?'

'আছে হুজুর, সিবিল-সার্জেনের সার্টিফিকেট।'

উকিলের মুখের দিকে চাহিয়া সারদাবাবু সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। দরখাস্ত মিথ্যা, সার্টিফিকেট মিথ্যা,—পীড়িত মক্কেল সেই মুহূর্তে আদালতের নিকটবর্তী এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জিলিপি ভক্ষণ করিতেছে।

তিনি কড়া স্বরে বলিলেন, 'দরখাস্ত নামঞ্জুর।'

বিস্মিত উকিল বলিলেন, 'হুজুর, সিবিল-সার্জেনের সার্টি—'

সারদাবাবু ততোধিক চড়া স্বরে বলিলেন, 'সার্টিফিকেট মিথ্যে, দরখাস্ত মিথ্যে !'

তিনি রোষরক্তিম চক্ষে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই, কিন্তু সকলেই বলিতেছে, 'বুড়ো বোম্বেটে বলে কি !······কুকুরে কামড়েছে, খ্যাপা কুকুর ! ··· মরেছে ব্যাটা লাল-মুখো—সিবিল-সার্জেন এবার ধ'রে চাব্‌কাবে।'

দরখাস্তকারী উকিল বলিতেছেন, 'দাঁড়াও যাদু, তোমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করছি···হুজুর, স্পষ্ট করে আর একবার নিজের মন্তব্য প্রকাশ করবেন কি ? আমি হয়তো শুনতে ভুল করেছি, কিন্তু সিবিল-সার্জেনের সার্টিফিকেট মিথ্যে—এই কথাই কি আপনি বল্‌তে চান ?···বল্‌ শালা, আর একবার বল্‌। তার পর তোর বাপের নাম না ভুলিয়ে দিতে পারি তো আমি···বলুন হুজুর !'

সারদাবাবু ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন, 'বেরোও—বেরোও—পাজি নচ্ছার চোর ! এই চাপরাশি, কান পাকাড়কে সবকো নিকাল দেও !· '

সায়ংকাল। সারদাবাবু অত্যন্ত বিমর্ষভাবে নিজের গৃহের বারান্দায় একটি ঈজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ। শহরের সর্বত্র উকিল-মহলে ও হাকিম-মহলে—যে বিরাট হইচই বাধিয়া গিয়াছে তাহা কানে না শুনিলেও তাঁহার বুঝিতে বাকি নাই। হয়তো এতক্ষণে মহামান্য হাইকোর্টেও খবর গিয়াছে। উকিল-সম্প্রদায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার বান্দা নয়।

গৃহিণী আসিলেন। কয়েক বার তাঁহার সম্মুখে পায়চারি করিলেন, তার পর তাঁহার মুখ যেন হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছেন এমনই ভাবে বলিয়া

উঠিলেন, 'ওগো, তোমার শরীর সত্যিই খারাপ হয়েছে। "না" বললে শুনব কেন! খেটে খেটে যে কালী হয়ে গেলে; এ বয়সে অত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন! আমি বলি, ছুটি তো পাওনা রয়েছে, ছুটির দরখাস্ত দাও—কিছু দিন পুরীতে নাহয়···কাপড়খানা কি এখনও চোখে পড়ছে না। · শরীর আগে, তার পর চাকরি—'

সারদাবাবু গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন, কোনও কথাই বলিলেন না।

মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া গৃহিণী প্রস্থান করিবার পর কন্যা আসিল। হাসি হাসি মুখ, চোখে চপল দৃষ্টি।

কন্যা বলিল, 'বাবা, তোমার মাথায় বড্ড পাকা চুল হয়েছে—তুলে দেব?'

কন্যাটিকে সারদাবাবু বড় ভালোবাসিতেন, তাই চোখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিলেন না। সেখানে কোন্ কালসর্প লুকাইয়া আছে কে জানে। সপ্তদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা—সারদাবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। মুন্সেব সুবোধ আসিতেছে। কন্যা বোধ হয় পিতার পাকা চুল তুলিতে এত তন্ময় যে তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইল না।

সুবোধ আসিয়া বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াইল। সুবেশ সৌখীন যুবক, হাতে ছড়ি। সারদাবাবু দেখিলেন, সে সসম্ভ্রম চক্ষে তাঁহার মেয়ের পানে তাকাইয়া আছে।

কিন্তু সারদাবাবু তাহার মনটাও পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মাথার মধ্যে একটা শিরা যেন হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। তিনি উঠিয়া সুবোধের উপর লাফাইয়া পড়িলেন, তাহাকে এলোপাথাড়ি লাথি

কিল চড় মারিতে মারিতে ফেনায়িত মুখে বলিতে লাগিলেন, 'শুয়োর! কুকুর! পাঁঠা!...'

* * *

গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গের ওজুহাতে ছয় মাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিয়া সেই রাত্রে সারদাবাবু কাতরকণ্ঠে বরদাত্রী দেবীকে জানাইলেন, 'মা, তোমার বর ফিরিয়ে নাও। যথেষ্ট হয়েছে--আর চাই না—'

ভালবাসা লিমিটেড

ভাস্করানন্দ, ললিত, বাসুদেব ও সাধুপদ—এই চারজন ছিল একাধারে লিমিটেড্ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও প্রধান অংশীদার; তাহাদের নামের আদ্য অক্ষর লইয়া কোম্পানীর নামকরণ হইয়াছিল—ভালবাসা। বাকি যে সব অংশীদার বাংলাদেশের যত্রতত্র ছড়ানো ছিল তাহাদের সমষ্টিকে নির্দেশ করিবার জন্য ছিল—লিঃ।

একদা ডিরেক্টারগণ সমবেত হইয়া সংকল্প করিলেন যে সিনেমার ব্যবসা করিতে হইবে। কারণ, সম্প্রতি দেখা যাইতেছে উহাতেই কাঁচা পয়সা বেশি। আপাততঃ একটা স্টুডিও ভাড়া লইয়া ছবি তুলিলেই চলিবে, তারপর ছবির মুনাফা হইতে কুড়ি পার্সেন্ট্ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিয়া বাকি যে কয়েক লক্ষ টাকা বাঁচিবে তাহাতে নিজস্ব স্টুডিও খুলিয়া রীতিমত ব্যবসা আরম্ভ হইবে।

ভাস্করানন্দ বলিল, 'আমি সিনেরিও লিখব,' ডায়ালগ্ লিখব, প্রযোজনা করব, উঃ—মাইরি! অ্যাসা একটা প্লট আমার মাথায়

আছে – সে-প্লট ছবির পর্দায় উঠলে দেশের লোক বাপ্ বাপ্ বলে টিকিট কিনবে। হরদম ইয়ে—কিছু আর বাকি রাখব না, সব দেখাব।'

ললিত বলিল, 'আমি হীরোর পার্ট নেব,'—বলিয়া আয়নার দিকে তাকাইয়া নানা ভঙ্গিতে ভ্রূ নাচাইতে লাগিল।

ভাস্করানন্দ বলিল, 'বেশ। আর বাসুদেব নেবে ভিলেনের পার্ট—তোফা মানাবে।'

বাসুদেব চটিয়া বলিল, 'কি! আমার চেহারা ভিলেনের মতো? তোমার চেহারা তো ছিঁচ্‌কে চোরের মতো—তুমি করো না! আমি ভিলেন হব না।'

ভাস্করানন্দ গরম হইয়া বলিল, 'কুছ পরোয়া নেই—হয়ো না। ভিলেন্ ভাড়া করে আনব। বাংলাদেশে ভিলেনের অভাব নেই, জেনো।'

এতক্ষণে সাধুপদ কথা বলিল। সে ডিরেক্টারদের মধ্যে সবচেয়ে নিরেশ; অতটা হাল্‌ফ্যাশানের নয়, মাথায় ক্ষুদ্র টিকি আছে—তাই সকলে যুক্তি করিয়া তাহাকে কোম্পানীর খাজাঞ্চি নিযুক্ত করিয়াছিল। সে বলিল, 'শুধু ভিলেন নয়, হীরোয়িনও ভাড়া করতে হবে। তা ছাড়া আরও আছে।—অনেক খরচ।' সে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

ললিত বলিল, 'হোক্ খরচ। ভালো হীরোয়িন চাই। বিজ্ঞাপন দাও। খেঁদি-পেঁচী-পুঁটি চলবে না,'—বলিয়া পুনশ্চ ভুরু নাচাইতে লাগিল।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। তাঁহার উত্তরে যিনি আসিলেন তিনি একটি নবায়মানা তরুণী, তারুণ্যের প্রাচুর্যে তাঁহার তনুলতা টলমল। নাম ছলনা দেবী।

হাসি এবং কথা, নৃত্য এবং গীত—সকল ক্ষেত্রেই তিনি অনন্যপূর্বা।

তিনি যখন তিনশত টাকা মাসিক বেতনের চুক্তিপত্র লিখাইয়া লইয়া নৃত্যচপল ভঙ্গীতে প্রস্থান করিলেন, তখন চারিজন ডিরেক্টারই কিছুক্ষণ হাস্য-বিকশিত বোকাটে মুখ লইয়া বসিয়া রহিল।

তারপর ভাস্করানন্দ লাফাইয়া উঠিয়া দেরাজের ভিতর হইতে খাতা বাহির করিয়া প্রাণপণে লিখিতে আরম্ভ করিল। হীরোয়িনকে দেখিয়া তাহার দারুণ প্রেরণা আসিয়াছে।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিল, 'ভিলেনকে কি করতে হবে।'

ভাস্করানন্দ লিখিতে লিখিতে বলিল, 'নারী-হরণ—মানে নারী-হরণের চেষ্টা। হীরোর বিক্রমে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে।'

ললিত আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—'এবং শেষ পর্যন্ত হীরোর সঙ্গে হীরোয়িনের মিলন হবে।' তাহার ভ্রূযুগল তখন কপালের উপর তাণ্ডব শুরু করিয়া দিয়াছে।

বাসুদেব বলিল, 'কুছ পরোয়া নেই, আমিই ভিলেন হব।'

সাধুপদ বলিল, 'বাঁচা গেল। তুমি ত্রিশ টাকা মাসে হাতখরচ পাবে। ভিলেনের পক্ষে ওই যথেষ্ট।'

ললিত উদার ভাবে বলিল, 'আমার কিছু চাই না।'

পরদিন হইতে মহলা শুরু হইল। ভাস্করানন্দই ডিরেক্টার। তাহার নির্দেশ অনুসরণ করিয়া, হীরো এবং ভিলেন উভয়েই এমন বস্তুতান্ত্রিক অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল, হীরোর স্পর্শন চেষ্টা ও ভিলেনের ধর্ষণ চেষ্টা এতই জীবন্ত হইয়া উঠিল যে সকলের তাক লাগিয়া গেল। হীরোয়িনের কিন্তু কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই, তিনি নিরপেক্ষভাবে হীরোর কবল হইতে ভিলেনের কবলে এবং ভিলেনের কবল হইতে হীরোর কবলে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

রিহার্শাল চলিতে লাগিল। আপাতদৃষ্টিতে সকলেই খুশী। এমন

কি সাধুপদর ক্ষুদ্র টিকিও মাঝে মাঝে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে দেখা গেল।

রিহার্শাল শেষ হইয়া ছবি তোলা আরম্ভ হইবে। স্টুডিও, ক্যামেরাম্যান, শব্দ-যন্ত্রী সব ঠিক হইয়া গিয়াছে।

একদিন রাত্রি দশটার সময় বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটি বাড়ির দরজার সম্মুখে হীরো ও ভিলেনের মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া গেল।

ললিত জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বাসুদেব বলিল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ললিত হুংকার দিয়া বলিল, 'হুঁ, বুঝেছি।'

বাসুদেবও হুংকার দিল, 'হুঁ—বুঝেছি।'

ফুটপাথের উপর উভয়ের হাতাহাতির উপক্রম হইল।

এমন সময় বাড়ির দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিল সাধুপদ দুজনাকে চপেটা-যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া সে বলিল, 'একি, তোমরা এখানে লড়াই করছ কেন?'

উভয়েই নির্বাক। তার পর উভয়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে ইহা রিহার্শাল মাত্র।

সাধুপদ বলিল, 'আমি এসেছিলুম ছলনা দেবীকে বোঝাতে, তিনি মাইনেটা যাতে কিছু কম করেন। অনেক বুঝিয়ে দেড়শ' টাকায় রাজি করেছি।—ঐ একটা কনস্টেবল্ আসছে। চলো।'

পরদিন বেলা এগারোটার সময় স্টুডিওতে সকলে প্রস্তুত হইয়া আছে, ছবি তোলা আরম্ভ হইবে। কিন্তু হীরোয়িনের দেখা নাই। কিছুক্ষণ পরে সকলে লক্ষ্য করিল খাজাঞ্চি সাধুপদও অনুপস্থিত।

হীরো ও ভিলেন একই ট্যাক্সিতে চড়িয়া ছুটিল। ছলনা দেবীর গৃহে গিয়া দেখিল, হীরোয়িন ও খাজাঞ্চি একসঙ্গে উড়িয়াছে—এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর তহবিল।

* * *

ভালবা (সা) লিঃ কুকুরের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। কুক্কুরজাতির স্বাভাবিক চরিত্রহীনতার সুযোগ লইয়া নানাপ্রকার বর্ণসংকর কুক্কুরশাবক তৈয়ার করিয়া বিলাতী খদ্দের মহলে বিক্রয় করিতেছে। শুনা যাইতেছে ভালবা (সা) লিঃ আগামী বৎসর ২% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিবে। শেয়ারের দাম চড়িতেছে।

মৎস্যন্যায়

প্রকাণ্ড ঝিলে অনেক মাছ বাস করে।

একদল ছোক্‌রা মাছ ঝিলময় খেলিয়া বেড়ায়। তাহারা সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, ওজন তিন পোয়ার বেশি নয়।

ছোক্‌রা দলের মধ্যে একটি তরুণ মাছের মনে কিন্তু সুখ নাই। তাহার বিশ্বাস, তাহার মস্তিষ্কে অন্যদের চেয়ে বেশি ঘি আছে; তাই তাহার খেলাধূলা লাফালাফি ভালো লাগে না। যাহা কিছু আনন্দ-দায়ক তাহাকেই সে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। সে চায় সত্যের সাক্ষাৎ, বাস্তবের অপরোক্ষ অনুভূতি। সমবয়স্ক সঙ্গীদের ক্রীড়া-কৌতুক, রঙ্গ-রস তাহার অত্যন্ত খেলো বলিয়া মনে হয়।

একদিন সে ভাবিয়া চিন্তিয়া পাকা রুইয়ের কাছে গেল।

পাকা রুইয়ের অনেক বয়স, বিজ্ঞ বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। বেশি নড়িতে চড়িতে পারে না; রাঙা গায়ে শ্যাওলা জমিয়াছে। ঝিলের সব চেয়ে গভীর অংশে পাঁকের উপর বসিয়া পাকা রুই দু'একটি বুদ্বুদ ছাড়িতেছিল এবং পলকহীন চক্ষে তাহাদের উর্ধ্বগতি নিরীক্ষণ করিতেছিল, ছোক্‌রা মাছ তাহার কাছে গিয়া বসিল।

চোখ বাঁকাইয়া পাকা রুই ছোক্‌রাকে দেখিল, ল্যাজ একটু নাড়িয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিল, 'কি হে ভায়া, এদিকে কি মনে করে?'

ছোক্‌রা মাছ কয়েকবার কান্‌কো খুলিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস লইল, বলিল, 'আপনি এত নিচে থাকেন কি করে? আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

পাকা রুই একটু হাসিয়া দুইটি বুদ্বুদ উর্ধ্বে প্রেরণ করিল, 'তোমার এখন বয়স কম, ভায়া, গভীর জলের মর্ম বুঝবে না। কি চাও বলো।'

ছোক্‌রা বলিল, 'বাস্তবকে জানবার জন্যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আপনি বাস্তবের সন্ধান দিতে পারেন?'

ঘোলা চোখ দিয়া পাকা রুই কিছুক্ষণ ছোক্‌রাকে নিরীক্ষণ করিল, 'যে জল-বাতাসে রয়েছ, তাতে বুঝি আর মন উঠছে না?'

ছোক্‌রা বলিল, 'না। আমি চাই উলঙ্গ সত্য—কঠিন বাস্তব, এসব ছেলেখেলা আমার ভালো লাগে না। আপনি শুনেছি জ্ঞানী, ঝিলে আপনার মতো প্রবীন আর কেউ নেই। তাই আপনার কাছে এসেছি।'

'বেশ করেছ। আমার পরামর্শ যদি চাও, দলের ছেলে দলে ফিরে যাও।'

'না। আমি বাস্তবের সন্ধান চাই।'

পাকা রুই স্তিমিত নেত্রে কিছুক্ষণ পুচ্ছ স্পন্দিত করিল।

'আমার ঠোঁটের পাশে একটা কালো চিহ্ন দেখছ?'

'দেখছি।'

'ওটা বাস্তবের শীলমোহর। ভালো চাও তো খেলা করো গিয়ে।'

'না। খেলাতে আমার অরুচি, আমি সত্যিকার জীবন-সাক্ষাৎকার চাই।'

পাকা রুই একটা নিশ্বাস ফেলিল, কয়েকটি বুদ্বুদ বাহির হইল।

'বেশ, চলো তবে। আমার কিন্তু দায়-দোষ নেই।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'পশ্চিম দিকের বাঁধাঘাটে; ঐখানেই বাস্তবের আখড়া।'

'কিন্তু, সেদিকে যে যাওয়া বারণ! শুনেছি, মৎস্যপুরাণে লিখেছে, ওদিকে গেলে পাপ হয়।'

'চরম সত্যের সন্ধান পেতে হ'লে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পাপ-পুণ্যের কথা ভুলতে হবে।'

'স্বচ্ছন্দে। আমি ওসব কুসংস্কার ভুলতেই চাই। চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।'

পাকা রুই তখন ছোক্‌রাকে লইয়া মন্থরগমনে পশ্চিমের বাঁধাঘাটের দিকে চলিল। পথে কয়েকজন ছোক্‌রা মাছের সঙ্গে দেখা হইল; তাহারা সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, 'কিরে, ভূষণ্ডি-বুড়োর সঙ্গে কোথায় চলেছিস্?'

সগর্বে পুচ্ছ আস্ফালন করিয়া তরুণ বলিল, 'বাস্তবের সন্ধানে।'

ঝিলের পশ্চিম দিকে তখন সূর্যের আলো তেরছা ভাবে পড়িয়া তল পর্যন্ত আলোকিত করিয়াছে। একটি সূক্ষ্ম সূতা লম্বভাবে স্বচ্ছ জলের মধ্যে ঝুলিতেছে; তাহার প্রান্তে গোলাকৃতি একটি ক্ষুদ্র বস্তু। জলের মৃদু তরঙ্গে সেই ক্ষুদ্র বস্তুটি হইতে একটি অপূর্ব স্বাদ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

পাকা রুই বেশ খানিকটা দূর হইতে চোখের ঠারে সেই বস্তুটি ছোক্‌রাকে দেখাইয়া বলিল, 'সুতোর ডগায় ঐ যে ঝুলছে দেখছ, ওটি হচ্ছে জ্ঞানবৃক্ষের ফল। ওটি খেলে আর কিছুই জানতে বাকি থাকবে না।'—বলিয়াই পাকা রুই পিছু ফিরিল।

ছোক্‌রা মাছ ছুটিয়া গিয়া টোপ গিলিল। সঙ্গে সঙ্গে খ্যাঁচ করিয়া টান! কয়েক মুহূর্ত মধ্যে ছোক্‌রা মাছ ডাঙায় উঠিয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল, 'ওরে বাবারে, গেলুম রে, এ যে নিশ্বাস নিতে পারছি না!'

মানুষের গলা শোনা গেল।

'আরে দূর, এ যে একেবারে চারা মাছ! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, এখনও অনেক বড় হবে—'

আর একজন বলিল, 'চারে বড় মাছ এসেছিল, আমি ভাবলুম বুঝি সেইটেই টোপ গিলেছে—'

নির্দয়ভাবে ঠোঁট ছিঁড়িয়া মানুষটা বঁড়শি খুলিয়া লইল। তারপর—ঝপাং! ছোক্‌রা মাছ আবার জলে গিয়া পড়িল।'

ঠোঁটের যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাহার মনে হইল—আহা, অমৃত! অমৃত! অমৃত!

ছোক্‌রা মাছ দলে ফিরিয়া গেল।

সকলে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি-রে, এরি মধ্যে ফির্‌লি যে! বাস্তব-দর্শন হ'ল?'

ছোক্‌রা বলিল, 'ও কথা যেতে দে।—আয় ভাই খেলা করি।'

✓মেথুশীলা

বাইবেল-বর্ণিত মেথুশীলা পুরুষ ছিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু বাংলাদেশে আসিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী চারুশীলার সহিত মিল বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে একথা যদি তাঁহার জানা থাকিত তাহা হইলে বোধ করি নয়শত উনসত্তর বছব বয়সেও তিনি মরিতে রাজি হইতেন না। কিন্তু মুশার ভগবান বৃদ্ধ বয়সে একটু রসিকতা করিবার বাসনা করিয়া ছিলেন, তাই—

সর্দা আইন পাস হইবার কিছুদিন আগেকাব কথা। সনাতন ধর্মের জাত বাঁচাইবার জন্য নিষ্ঠাবান হিন্দু মাত্রেই আত্মীয়-কুটুম্ব যে যেখানে আছে সকলের বিবাহ দিয়া ফেলিতেছেন : গ্রহণ লাগিলে আর আহার চলিবে না। ইত্যবসরে সন্দেশ ও মৎস্যের দর ভয়ংকর চড়িয়া যাইতেছে।

জমিদার লালমোহন চৌধুরী মহাশয়কে সনাতন হিন্দু ধর্মের বিজয়স্তম্ভ বলিলে সম্ভবতঃ তাঁহার বাবুর্চি নিয়ামৎ মিঞা দাঁত বাহির করিয়া ভাল্লুকের মতো হাসিবে, অতএব সেকথা বলিব না, কিন্তু তিনিও এই হিড়িকে পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পুত্র অবশ্য নাবালক নয়, তাহার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স—আইনে বাধে না। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের দুরভিসন্ধি অন্য প্রকার,—তিনি একটি দশবর্ষীয়া বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে চান। চৌধুরী পরিবারের কোনো বধূই আজ পর্যন্ত দশ বৎসরের অধিক বয়স লইয়া দুধে-আল্‌তায় পা দেয় নাই।

কিন্তু পুত্র ব্রজমোহনের মনে ভাবী বধূ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ

পরিকল্পনা বিদ্যমান ছিল। তা দিয়া ডিম ফুটাইয়া ছানা লালনপালন করিয়া দাম্পত্য জীবনের কলকাকলির ভূমিকা প্রস্তুত করিতে সে উৎসুক ছিলনা। সাধারণ বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল যে মাত্র তেইশ বৎসর ইহা সে কলেজে পড়িয়া জানিয়া লইয়াছিল। তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে বধূ হইবে ডাঁশা পেয়ারার মতো, বয়স হইবে সতের কিংবা আঠারো, রূপের চেয়ে রসে বেশি ঢলঢল করিবে, প্রেমের অভিজ্ঞতা (পরোক্ষভাবে) ভিতরে ভিতরে ভালো রকম থাকিবে, এবং স্বামী প্রথম চুম্বন করিলে 'বাবা গো!' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে না। শেষোক্ত রূপ ঘটনা চৌধুরী পরিবারে ইতিপূর্বে একবার ঘটিয়া গিয়াছিল।

সুতরাং আদর্শ লইয়া পিতা-পুত্রে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু লালমোহনবাবু—সম্ভবতঃ মুর্গী খাইতেন বলিয়া—পুত্রের আদর্শকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিলেন না, তিনি কুটিল কুপথ ধরিলেন। ব্রজমোহনের পিছনে তার্কিক লাগিল. দুই আদর্শের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বাড়িতে অষ্ট প্রহর তর্ক চলিতে লাগিল।

বড় পক্ষের প্রধান কৌঁসুলি মেজবৌদি, মেয়েদের মধ্যে তাঁহার তর্কই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসংগত। একদিন তিনি কোমর বাঁধিয়া ব্রজকে বুঝাইতে বসিলেন। অন্যান্য কথার পর বলিলেন, 'বিশ বছরের একটা ধাড়ি মেয়ে বিয়ে করে আন্‌বে, সেটাই কি দেখতে শুনতে ভালো হবে?'

ব্রজ বলিল, 'বিশ বছরের ধাড়ি মেয়ে মন্দ কিসে?'

মেজবৌদি বলিলেন, 'সব দিক দিয়েই মন্দ। মাগো, ভাবতেই যেন গা কেমন করে ওঠে!'

ব্রজ বলিল, 'শুধু মুখে বললে হবেনা, প্রমাণ করতে হবে।'

মেজবৌদি তর্কের ঝোঁকে বলিলেন, 'প্রমাণ আবার কি? তোমার যে অনাছিষ্টি কথা! বিশ বছরের পাকা মেয়ে কখনো ভালো হয়?'

ব্রজ জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার এখন বয়স কত ?'

মেজবৌদি চালাকি করিয়া কথাটা এড়াইয়া গিয়া বলিলেন, 'তুমি বড় বাজে তর্ক করো। ধান ভান্‌তে শিবের গীত !—দেখ দিকিন্ আমাদের কেমন বিয়ে হয়েছিল, যখন শ্বশুরবাড়ি এলুম তখন বর কাকে বলে তাই জানিনা।'—বলিয়া সুখের হাসি হাসিলেন।

ব্রজ বলিল, 'খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু বর কি বস্তু তা জেনে শ্বশুরবাড়ি আসতেই বা দোষ কি ?'

বৌদি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'ছেলেবেলায় বিয়ে না হ'লে মনের মিল হয় না।'

বিস্মিত ব্রজ বলিল, 'একথা তুমি কোথায় পেলে ? তাহ'লে পিসিমার সঙ্গে পিসেমশায়ের মনের মিল হয়নি কেন ?'

নজিরটা খারাপ। হটিয়া যাইতেছেন দেখিয়া বৌদি বলিলেন, 'ওসব বাজে কথা, কনে-বৌ কচি-মেয়ে না হ'লে কি মানায় ? শাস্ত্রে কি লিখেছে জানো ?'

ব্রজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ শাস্ত্রে ? বেদে, না মনু-সংহিতায় ?'

বৌদি অধীর ভাবে বলিলেন, 'অত জানিনে, তোমার খালি উল্টোপাল্টা কথা ! তাছাড়া ধাড়ি মেয়ে বিয়ে করার অনেক বিপদও আছে।'

'কি বিপদ ?'

'সে-সব কথা আমি বলতে পারব না। এই সেদিন আমাদের জানা-শোনা একজন লোক উনিশ বছরের এক মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলো—তারপর সে-বৌ ত্যাগ করতে হ'ল।'

ব্রজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'মোপাসাঁর *Madame Baptiste* পড়েছ ? পড়নি, কারণ ইংরেজি বা ফরাসী ভাষা তোমার

জানা নেই। যাহোক চন্দ্রশেখর পড়েছ নিশ্চয়। শৈবলিনীর বয়স তো উনিশ বছর ছিলনা। তবে অমন হ'ল কেন বলতে পারো?'

বৌদি হাসিয়া ফেলিলেন, 'ও তো গল্প—ওকি সত্যি নাকি? সত্যি হ'লে চন্দ্রশেখরকেই শৈবলিনী ভালোবাসত—প্রতাপের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিত।'

ব্রজও হাসিল, 'তা বটে। কিন্তু তোমার আসল প্রতিপাদ্যটা এখনো প্রমাণ হ'লনা। বড় মেয়ে নিন্দনীয় কিসে?"

মেজবৌদি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'দেখ, তুমি ছেলেমানুষ (ব্রজ মেজবৌদির চেয়ে বছর খানেকের বড়), তোমার কাছে সব কথা খুলে বলতে লজ্জা করে। যে মেয়ে ষোলো-সতের বছর বয়েস পর্যন্ত আইবুড়ো থেকে বাপের বাড়িতে কাটিয়েছে, সে ভেতরে ভেতরে পেকে ঝিঁকুট্ হয়ে গেছে। মনে মনে সে বুড়ী হয়ে গেছে, জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই তার জানতে বাকি নেই,—বুকের মধ্যে তার আশী বছর বয়েস। এরকম মেয়েকে বিয়ে করে কেউ কোনো সুখ শান্তি পায়নি ভাই—তুমিও পাবেনা।'

ব্রজ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, 'কে বলে পাব না? নিশ্চয় পাব। বরং সংসারযাত্রার অভিজ্ঞতার সম্বল যার নেই তাকে নিয়েই পথ চলা মুশকিল হয়ে পড়বে। তুমি যাকে আশী বছরের বুড়ী বলছ, সেই আশী বছরের বুড়ীই আমার চাই। দশ বছরের খুকী সুখ-শান্তির জানে কি? সে তা' দেবে কোত্থেকে? দেবার ক্ষমতা এক ঐ আশী বছরের বুড়ীরই আছে।'

বৌদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'সে বরং মন্দ কথা নয়, কিন্তু আশী বছরের আইবুড়ো বুড়ী পাওয়া মুশকিল হবে! সেকালে কুলীনদের ঘরে থাকত শুনেছি—'

ব্রজ ঈষৎ শান্ত হইয়া বলিল, 'আমি সে-বুড়ীর কথা বলিনি—আমি চাই বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা। মন যার পরিপুষ্ট হয়নি তাকে বিয়ে করে লাভ কি? সে তো খেলার পুতুল! আমি খেলার পুতুল চাই না।'

বৌদি উঠিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, বাবাকে সেই কথাই বলব।—কিন্তু এ-মেয়েটিকে একবার দেখে এলে পারতে—কচি মেয়ে চোখে দেখলে পাপ হবে এমন তো শাস্ত্রে লেখেনি।'

ব্রজ মুখ তুলিয়া বলিল, 'আবার কোন্ মেয়ে?'

'নতুন সম্বন্ধ এসেছে—কল্‌কাতার মেয়ে। বাবার খুব পছন্দ হয়েছে—কুষ্ঠিও মিলেছে। যাওনা—দেখলে হয়তো পছন্দ হয়ে যেতেও পারে '

'হুঁ। মেয়েটির বয়স কত? তিন না চার?'

'না গো না। এই আশ্বিন মাসে দশ পেরিয়ে এগারোয় পা দিয়েছে।'

'বলো কি! এখনো তার বাপকে কেউ একঘরে করছে না? তা—শিশুটির নাম কি?—পুঁটু না বুঁচু?'

'পুঁটু-বুঁচু নয়, চমৎকার নাম—মেথুশীলা।'

ব্রজ কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, শেষে হাসিয়া বলিল, 'ও, বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যেই বোধহয় এই নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এখনি দেখতে যেতে হবে, আরো বছর দশেক অপেক্ষা করলে হয় না?'

বৌদি রাগ করিয়া বলিলেন, 'তারা অতদিন হা-পিত্যেশ করে তোমার জন্যে বসে থাকতে পারবে না। তার ওপর আবার আইন হচ্ছে -'

ব্রজ চিন্তা করিল, 'হুঁ - তাহ'লে বাবার ইচ্ছে আমি এই মেয়েকে দেখতে যাই?'

'হ্যাঁ। আর তোমার দাদাদেরও তাই ইচ্ছে।'

'বেশ, যাব। কলকাতায় একটা কাজও আছে। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি আমার পছন্দ হবে না। তখন দোষ দিও না।'

বড়মানুষের বাড়িতে মেয়ে দেখা—যাহারা দেখিতে আসিতেছে তাহারাও বড়মানুষ, সুতরাং উদ্যোগ আয়োজন ভালোই হইয়াছিল। বৈঠকখানা ঘরের মেঝেয় কার্পেট পাতিয়া আসর প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পাড়ার গণ্যমান্য কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন। ব্রজর সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাহার দুই বন্ধু।

যথাবিধি আদর-আপ্যায়নের পর কন্যার বাপ সগর্ব হাস্যে জানাইলেন যে তাঁহার মেয়ে আজকালকার মেয়ের মতো নয়, তাহার বয়স মাত্র দশ বৎসর। বর্ষীয়ান্‌গণ মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। তারপর মেয়ের বাপ অন্দরে গিয়া মেয়েকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন। মেয়ে গালিচার উপর বসিয়া করযোড়ে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

মেয়েটি দেখিতে ছোট-খাটো, দোহারা, রং খুব ফরসা, মুখের গড়ন চমৎকার। ব্রজ একবার তাকাইয়া নিরুৎসুক ভাবে বসিয়া রহিল, ভাবিতে লাগিল,—মেয়েটা এখনো তাহাদের আগডুম-বাগ্‌ডুম খেলিবার জন্য আহ্বান করিতেছে না কেন? বন্ধুরা মেয়েকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিতে লাগিল।

হঠাৎ কি একটা কৌতুককর প্রশ্নে মেয়েটি হাসিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। ব্রজর সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল।

ব্রজ তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দেখা হয়েছে—এবার ভেতরে নিয়ে যান।'

মেয়েটি প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

কন্যার বাপ মতামত জানিতে চাহিলেন। ব্রজর সঙ্গে বন্ধুদের চোখে চোখে ইশারা হইল, তাঁহারা বলিলেন, 'পরে খবর পাঠাব।'

পরে খবর পাঠানোর একটি মাত্র অর্থ হয়। গৃহকর্তা বিমর্ষ হইয়া কন্যার বয়সের অল্পতার দিকে আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সকলেই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিলেন। গৃহকর্তা তখন জলযোগের প্রস্তাব করিতেই ব্রজ কোনমতে কাটাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেনে ফিরিতে ফিরিতে বন্ধুরা বহুবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে, ব্যাপারটা কি? খুলেই বলোনা। পছন্দ হয়নি তা তো বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু কারণটা কি? মেয়েটি তো দিব্যি সুন্দরী। দেখতে একটু ছোট বটে, কিন্তু নেহাত দশ বছরের বলে তো বোধ হ'ল না...'

ব্রজ বলিল, 'না, বয়স দশ-এগারো বছরের বেশি হবে না।'

বন্ধুদের সে কোনো কথা ভাঙিয়া বলিল না, কেবল ভাবিতে লাগিল, মেজবৌদির সঙ্গে যখন এই লইয়া আলোচনা হইয়াছিল তখন কি ভগবান কান পাতিয়া শুনিয়াছিলেন?

বাড়ি ফিরিয়া ব্রজ জানাইয়া দিল যে মেয়ে পছন্দ হয় নাই—মেয়ে অত্যন্ত ছোট।

রাত্রে মেজবৌদিকে চুপি চুপি বলিল, 'বৌদি, সে মেয়ের বয়স দশ বছর নয়—আশী বছর। তার চোখের মধ্যে অনাদি কালের অভিজ্ঞতা জমাট হয়ে আছে! সে এক ভয়াবহ ব্যাপার,—সত্যিই ও-মেয়ে মেথুশীলা। তিনকালের বুড়ী জরাজীর্ণ হাড়-গোড় নিয়ে ওর বুকের মধ্যে বসে আছে।—ও মেয়ে নিয়ে আমি কি করব?'—

এই বলিয়া ব্রজ শিহরিয়া চক্ষু মুদিল।

লম্পট

হেরম্ববাবু একজন লম্পট।

বয়স পঁয়তাল্লিশ। এ কার্যে নূতন ব্রতী নহেন; দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বেশ পরিপক্ব হইয়াছেন, সামান্য একটু নলচে আড়াল দিয়া কাজ করিয়া যান। আত্মীয়-বন্ধু এই লইয়া অন্তরালে একটু হাসি-তামাশা টীকা টিপ্পনী করেন। কিন্তু হেরম্ববাবু কৃতবিদ্য ব্যবসাদার, পয়সাওয়ালা লোক; তাঁহার চরিত্র লইয়া প্রকাশ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার কথা কাহারও মনেই আসে না।

হেরম্ববাবুর লাম্পট্যে রোমান্সের গন্ধমাত্র নাই। পাকা ব্যবসাদারের মতো এ বিষয়ে তিনি লাভ-লোকসানের খতিয়ানের দিকে নজর রাখিয়া চলেন। কত খরচ করিয়া কতখানি আনন্দ ক্রয় করিলে লাভে থাকা যায়, সেদিকে তাঁহার মন সর্বদা সতর্ক থাকে। হেরম্ববাবুর মনস্তত্ত্ব আর খোলাখুলিভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক হইয়া পড়ে, তাই যথাসাধ্য ঢাকাঢুকি দিয়া বলিতে হইতেছে। মোট কথা, তিনি একজন পাতি লম্পট।

শহরের নিম্নপ্রান্তে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পাড়ায় হেরম্ববাবু একটি ঘর ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ঘরটি ছিল তাঁহার আনন্দভবন; সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একটি রাত্রি তিনি এইখানে যাপন করিতেন। রাত্রি-যাপনের নির্জীব আসবাবপত্র সবই ঘরে মজুত থাকিত; সজীব উপকরণটি আসিত বাহির হইতে। আর কেহ এ ঘরের সন্ধান জানিত না; ইয়ার-বন্ধু লইয়া আমোদ করা হেরম্ববাবুর স্বভাব নয়। এ বিষয়ে তিনি অদ্বৈতবাদী।

একদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া হেরম্ববাবু নিজ আনন্দ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। দ্বারের চাবি খুলিয়া ঘরে প্রবেশপূর্বক আলো জ্বালিলেন; চাদরের ভিতর হইতে একটি পাঁট বোতল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন; তারপর দেয়াল-আলমারি হইতে গেলাস, সোডা ও কর্ক্-স্ক্রু লইয়া টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

আজ তাঁহার শরীর ঈষৎ ক্লান্ত, কিন্তু মনের মধ্যে অনেকখানি চঞ্চলতা রহিয়াছে। চঞ্চলতার কারণ, যে অভিসারিকাটির আজ দশটা হইতে সাড়ে দশটার মধ্যে আসিবার কথা, সে সাধারণী নয়। হেরম্ববাবু খেলোয়াড় লোক; অনেক খেলাইয়া মাছটিকে ডাঙায় তুলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, মাছটিও গভীর জলের মাছ।

একপাত্র সোডা-মিশ্রিত সোমরস পান করিবার পর হেরম্ববাবুর ক্লান্তি কাটিয়া গেল, শরীর বেশ চনমনে হইল। তিনি উঠিয়া পাঞ্জাবি ও চাদর খুলিয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিলেন, তারপর আবার আসিয়া বসিলেন।

সিগারেট ধরাইয়া তিনি আর এক পাত্র ঢালিলেন, চুমুকে চুমুকে তাহাই আস্বাদ করিতে করিতে হাত-ঘড়ি দেখিলেন, পৌনে নয়টা। এখনও অনেক সময়; আগ্রহের প্রাবল্যে আজ হেরম্ববাবু বড় তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ক্ষতি নাই; এরূপ অবস্থায় প্রতীক্ষা করার মধ্যেও বেশ রস আছে।

দ্বিতীয় পাত্রটি শেষ হইবার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল, গলা ছাড়িয়া গান করেন কিংবা তবলা বাজান। কিন্তু গলা ছাড়িলে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি টেবিলের উপর টপাটপ তবলা বাজাইতে লাগিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলিল। তারপর হেরম্ববাবু আর এক পাত্র

ঢালিয়া সিগারেট ধরাইলেন। ঘড়িতে দেখিলেন সওয়া-নয়। সময় বড় আস্তে কাটিতেছে; ঘড়ি কানে দিয়া দেখিলেন, চলিতেছে কি না। ঘড়ি টিকটিক করিয়া জানাইল, সে সচল আছে।

ক্রমে বোতলের রং হেরম্ববাবুর চক্ষুতে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, ঘরটি যেন ফিকা গোলাপী ধোঁয়ায় আবছা হইয়া গিয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন অনাগতা অভিসারিকার কথা···মানস-বিলাসে মনের বলগা ছাড়িয়া দিলেন।···

বোতলের লালিমা কমিয়া কমিয়া তলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। হেরম্ববাবু মানস-বিলাসে ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিতেছেন ও সৃক্কনি লেহন করিতেছেন।

*   *   *

একটি রমণী নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, হেরম্ববাবু টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন। বোতলটা উল্টাইয়া পড়িয়াছে।

কাছে আসিয়া রমণী তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া ঈষৎ নাড়া দিল। হেরম্ববাবু বিজবিজ করিয়া কিছু বলিলেন, কিন্তু জাগিলেন না; স্বপ্ন-বিলাসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বোধ হয় আপত্তি জানাইলেন।

রমণীর দুই অধর-কোণ হাসির অনুকৃতিতে একটু অবনত হইল। সে হেরম্ববাবুকে ধরিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। হেরম্ববাবু বিজবিজ করিয়া আপত্তি করিলেন। কিন্তু রমণী তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া শয্যার কাছে লইয়া গেল এবং সন্তর্পণে শোয়াইয়া দিল· হেরম্ববাবুর বিজবিজ কথাগুলি একটি স্থির হাসিতে রূপান্তরিত হইয়া অধরে লাগিয়া রহিল।

শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একান্ত প্রণয়হীন চক্ষে রমণী কিছুক্ষণ তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল। শেষে খোপা হইতে একটি গোলাপ ফুল লইয়া

বিছানার উপর ফেলিয়া দিল ; তারপর আলো নিবাইয়া সাবধানে দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে হেরম্ববাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তিনি গত রাত্রির কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। মাথার ভিতরটা বারুদ-ঠাসা বোমার মত হইয়া আছে ; কিন্তু স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। রাত্রে সে আসিয়াছিল। তারপর— ?

ম্লান বিমর্দিত গোলাপটি তাঁহার চোখে পড়িল।

হেরম্ববাবু মনের মধ্যে পরম তৃপ্তি অনুভব করিলেন। বাস্তবের স্মৃতি ও মনোবিলাসের স্মৃতি মিলিয়া তাঁহাকে দৃঢ় প্রত্যয় দিল যে, কাল রাত্রিটা ভালোই কাটিয়াছে।

ব্যবসাদার হেরম্ববাবু যে ঠকিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া পড়িলেন। উল্টানো বোতলটার তলায় তখনও কিছু তরলদ্রব্য ছিল, তাহাই পান করিয়া তিনি খোঁয়াড়ি ভাঙিলেন।

শাপে বর

সস্তায় বাড়ি ভাড়া লইয়া বড় প্যাঁচে পড়িয়াছিলাম।

কয়েক বছর আগেকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও এমন মৌরসী পাট্টা লইয়া বসে নাই ; এই পোড়া কলিকাতা শহরেই চেষ্টা করিলে ভদ্রলোকের বাসোপযোগী বাড়ি কম ভাড়ায় পাওয়া যাইত।

পাড়াটা তেমন ধোপদুরস্ত নয়, বাড়িখানাও পুরানো, কিন্তু বেশ

ঝরঝরে; এঁদোপড়া নোনাধরা নয় তাহার উপর ভাড়া মাত্র কুড়ি টাকা শুনিয়া দাঁও মারিবার মতলবে একেবারে এক বছরের লেখাপড়া করিয়া লইয়াছিলাম। মনে মনে এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলাম যে, বাড়িওয়ালার খুব মাথা মুড়াইয়াছি। এই কলিকালে বাড়িওয়ালার মাথা তাহার পিতৃশ্রাদ্ধেও কেহ মুড়াইতে পারে না, এ জ্ঞান তখনও হয় নাই।

জ্ঞান হইল যেদিন গৃহপ্রবেশ করিলাম সেইদিন সন্ধ্যাবেলা। দিনের আলো একটু ঘোলাটে হইতে না হইতে ঘরের মধ্যে ফর্-ফর্ ফর্-ফর্ শব্দ শুনিয়া দেখি, আরশোলা উড়িতেছে। তারপর যতই রাত্রি হইতে লাগিল ততই আরশোলা বাড়িতে লাগিল. পুরানো বাড়ির অসংখ্য ফাঁক-ফোকর-ফাটল হইতে বাহির হইয়া ঘরে ঘরে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের অগণ্য বলিলেও যথেষ্ট হয় না, পঙ্গপালের মতো সীমা-সংখ্যাহীন আরশোলা! মানুষ সম্বন্ধে তাহাদের মনে লেশমাত্র সম্ভ্রম নাই, জামাকাপড় ভেদ করিয়া শরীরের এমন দুর্গম স্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল যে, মৃতদেহেরও বিপন্ন হইয়া পড়িবার কথা। রাত্রে মশারির মধ্যে শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই, কোন্ অদৃশ্য ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া ইহারা আমাদের দাম্পত্য নিদ্রাকে নিরতিশয় বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিল। আমাকে যৎপরোনাস্তি উস্তম-খুস্তম তো করিলই, ওদিকে গৃহিণীর অবস্থা সত্য সত্যই সঙ্গীন করিয়া তুলিল।

তারপর যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় আছে, সমস্ত প্রয়োগ করিয়া এই নিশাচর পতঙ্গগুলাকে নিপাত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহারা এতই সংখ্যাগরিষ্ঠ যে কোনও ফল হইল না। দিনের বেলায় ইহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতে আবার দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া আসে। কয়েক দিনের মধ্যেই ইহাদের উৎপাতে পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

রবিবার সকালে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ভাবিতেছিলাম। বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারি, কিন্তু বাড়িওয়ালা কোনও ছুতানাতাই শুনিবে না, কান ধরিয়া এক বৎসরের ভাড়া আদায় করিয়া লইবে। অথচ এ বাড়িতে আর কিছুদিন থাকিলেই হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে পরিধেয় বস্ত্রখানি ফেলিয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে, ইহাও একপ্রকার সুনিশ্চিত। বাড়িওয়ালার উদ্দেশ্যে গালি দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কোনও ফল নাই। এখন উপায় কি?

চোখ তুলিয়া দেখি, ফেলু সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া ফেলু সবিস্ময়ে দন্ত বিকাশ করিল, আমি হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিলাম।

ফ্যালারামের সহিত আমার অনেক দিনের পরিচয়—প্রায় পাঁচ বছর পাশাপাশি বাড়িতে বাস করিয়াছি; ইদানীং কিছুকাল যাবৎ সে শহরের এক প্রান্তে এবং আমি অন্য প্রান্তে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলাম। তবু মাঝে মাঝে ট্রামে বাসে দেখা হইত। ফেলু বয়সে আমার কনিষ্ঠ, নেহাত সরল ভালোমানুষ গোছের লোক। নিয়মিত কোনও কাজকর্ম করিত বলিয়া আমার জানা নাই, অথচ বেশ সচ্ছলভাবেই সংসার চালাইত দেখিতাম। অন্ততঃ আমার নিকট হইতে কখনও টাকা ধার চাহে নাই। টাকা উপার্জনের নানা ফন্দি তাহার মাথায় ঘুরিত এবং আপাতদৃষ্টিতে ফন্দিগুলা হাস্যকর মনে হইলেও সে তাহা হইতেই কিছু না কিছু রোজগার করিয়া লইত।

সে আসিয়া বলিল, 'এ কি দাদা! আপনি এখানে?'

বলিলাম, 'কয়েকদিন হ'ল এ বাড়িতে উঠে এসেছি। তুমি এদিকে কি মনে করে?'

ফেলু আমার পাশে বসিয়া বলিল, 'বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, দাদা। বাড়িওলা নোটিশ দিয়েছে, তার নাকি মেয়ের বিয়ে।'

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল। ভগবান কি সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিলেন! যথাসাধ্য তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম, 'বাড়ি খুঁজছ! তা আমি এ বাড়িটা ছেড়ে দেব ভাবছি, আপিস থেকে বড় দূর হয়। তোমার যদি পছন্দ হয় নিতে পারো।'

বাড়িখানা একবার ঘুরিয়া দেখিয়াই ফেলু পছন্দ করিয়া ফেলিল, বস্তুতঃ দিনের বেলা বাড়ি কাহারও অপছন্দ হইবার কথা নয়। ভাড়া কুড়ি টাকা শুনিয়া ফেলু আরও মুগ্ধ হইল। আমি তখন বলিলাম, 'সারা বছরের ভাড়াটা কিন্তু আগাম দিয়ে দিতে হবে ভাই। জানো তো বাড়িওলাদের ব্যাপার—চুষুণ্ডি ব্যাটারা—'

ফেলু ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ঈষৎ বিহ্বলভাবে বলিল, 'কিন্তু দু শ' চল্লিশ টাকা তো এখন বার করতে পারবো না দাদা, একটু টানাটানি যাচ্ছে, মেরেকেটে দু-শ' টাকা দিতে পারি। তা বাকি টাকাটা যদি পরে নেন্—'

আমিও ক্ষণেক চিন্তা করিলাম। এই সুযোগ - অগ্রিম যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ, পরে আরশোলার খবর পাইলে ফেলুর মতো ভালো-মানুষও আর টাকা দিবে না।

সুতরাং উদার কণ্ঠে বলিলাম, 'বেশ, দু-শ' টাকাই নেব। তুমি তো আর পর নও। বাকি টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না।

আহ্লাদে ও কৃতজ্ঞতায় ফেলু গদগদ হইয়া উঠিল। স্থির হইল আগামী রবিবার সে এ বাড়িতে উঠিয়া আসিবে, আমি ইতিমধ্যে অন্য বাড়ি খুঁজিয়া লইব।

অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে ফেলু সপরিবারে আসিয়া বাড়ি দখল করিল,

আমি দুইশত টাকা পকেটে পুরিয়া বাড়িটিকে মনে মনে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায় লইলাম। স্থির করিলাম, ভবিষ্যতে ফেলারামকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিব। তার স্বভাবটা খুবই শান্ত, কিন্তু বলা তো যায় না।

মাস দুয়েক নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তারপর হঠাৎ একদিন এক সিনেমা বাড়ির দরদালানে ফেলুর সহিত দেখা। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া কাটিয়া পড়িবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু সে 'দাদা দাদা' বলিয়া ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে আরশোলা সম্বন্ধে যত প্রকার কৈফিয়ৎ ভাবিয়া লওয়া সম্ভব তাহা ভাবিয়া লইলাম।

ফেলুর মুখে কিন্তু জিঘাংসার ভাব না দেখিয়া একটু খটকা লাগিল, সে যেন আমাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছে। তবু মুখে সংশয়-কুণ্ঠিত একটু হাসি আনিয়া বলিলাম, 'আরে ফেলু যে! তারপর, কেমন আছ?'

ফেলু একগাল হাসিয়া একগঙ্গা কথা বলিয়া গেল, 'ভালোই আছি দাদা। ভাগ্যে বাড়িখানা আপনি দিয়েছিলেন, বলতে নেই তারই কল্যাণে করে খাচ্ছি। আপনি লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানিনা, বাড়িটিতে আরশোলা ছিল দাদা—এন্তার আরশোলা ছিল। তাই দেখে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল দিলুম এক সাইনবোর্ড টাঙিয়ে 'হাঁপানির পাঁচন।' বললে বিশ্বাস করবেন না দাদা, কাতারে কাতারে লোক; সকাল-বিকেল নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই। বৌ রান্নাঘরে উনুন জেলে আরশোলার ক্বাথ তৈরি করে, আর আমি তাই আট আনা শিশি বিক্রি করি। কলকাতা শহরে এত হেঁপো রুগী আছে, কে

জানত? রোজ নিদেন পক্ষে দশ টাকার ওষুধ বিক্রি করি; হাঁপানির ধন্বন্তরী নাম বেরিয়ে গেছে। কিন্তু—'

ফেলু একটু বিমনা হইয়া চিন্তা করিল, 'একটু ভাবনার কথা হয়েছে দাদা, আরশোলা ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। আচ্ছা, আপনি তো অনেক জানেন শোনেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আরশোলার টেণ্ডার কল্ করলে কেমন হয়। এমন ব্যবসাটা শেষে আরশোলার অভাবে ফেঁসে যাবে?'

ইহাকেই বলে পুরুষস্য ভাগ্যং— !

শুক্লা একাদশী

আকাশের চন্দ্র ও পাঁজির তিথিতে কোনও মতভেদ ছিল না- আজ শুক্লা একাদশীই বটে।

রাত্রির আহারাদি শেষ করিয়া বিনয় তাহার বাঁশের বাঁশিটি লইয়া ছাদে উঠিয়াছিল। আকাশে শুক্লা একাদশীর চন্দ্রকুহেলি, চারিদিকে কলিকাতার সংখ্যাহীন ছাদের চক্রব্যূহ। বিনয় পরিতৃপ্ত মনে পাশের বাড়ির ছাদের দিকে তাকাইয়া বাঁশিতে ফুঁ দিয়াছিল। বাঁশি মুগ্ধ কূজনে বাজিতেছিল—

আজি শুক্লা একাদশী,
হের তন্দ্রাহারা শশী,
স্বপ্ন পারাবারের খেয়া
একেলা চালায় বসি।

পাশের বাড়ির ছাদে কিছুদিন যাবৎ একটি মেয়ের আবির্ভাব হইতেছিল। দুই ছাদের মাঝখানে একটি অতলস্পর্শ সংকীর্ণ গলির

ব্যবধান ; তবু আলিসার পাশে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইলে হাতে-হাতে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হইতে পারে। মেয়েটি পাশের বাড়িতে সম্প্রতি আসিয়াছে ; তাহার বোধ হয় রাত্রে শয়নের পূর্বে ছাদে বেড়ান অভ্যাস। দুই জনের অভ্যাস সমকালীন হওয়ায়, প্রথমে দেখাসাক্ষাৎ ও পরে আলাপ হইয়াছিল। মেয়েটির নাম বিনতা।

বিনতার বয়স কতই বা হইবে ? বিনয়েরই সমবয়সী, কিংবা দু'এক বছরের ছোট। চাঁদের আলোতেই বিনয় তাহাকে দেখিয়াছিল। চোখ দুটি বড় বড়, মখমলের মতো নরম আর কালো ; গায়ের রং কুমুদের মতো শাদা। ঘন চুলের মাঝখানে সিঁথির সূক্ষ্ম রেখাটি নিষ্কলঙ্ক।

বলিয়া রাখা ভালো যে বিনয়ের ইতিপূর্বে একটিও মহিলা বন্ধু ছিল না ; তাই অপ্রত্যাশিতভাবে ছাদের উপর একটি বন্ধু পাইয়া সে পরম যত্নে এই তত্ত্বটি সকলের কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এমন কি পাশের বাড়িতে খোঁজ খবর লইয়া বন্ধুটির পরিপূর্ণ পরিচয় পাইবার চেষ্টাও করে নাই। তাহাদের পরিচয় শুধু শয়নের পূর্বের ঐ অল্প সময়টুকুর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

প্রথম মেয়েটি নিজেই উপযাচিকা হইয়া বিনয়ের সহিত আলাপ করিয়াছিল। বিনয় ক'দিন ধরিয়া একটা গানের সুর লইয়া বাঁশির সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছিল ; কিন্তু বাঁশিও বাঁকিয়াছিল—কিছুতেই তাহার অভীষ্ট স্বরটি বাহির করিতেছিল না। শেষে বিনয় যখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে, তখন পাশের ছাদ হইতে আওয়াজ আসিল, 'আপনি তিলক কামোদ বাজাবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু বেরুচ্ছে কেদারা। কড়ি মধ্যম দেবেন না, তা হ'লেই ঠিক হবে।'

ইহাই সূত্রপাত। তারপর বিনয় কড়ি-মধ্যম বর্জন করিবার চেষ্টা

করিয়াছিল, কিন্তু সমর্থ হয় নাই। মেয়েটি তখন অধীরভাবে বলিয়াছিল, 'দিন আমাকে বাঁশি, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

অতঃপর একটি শুক্ল পক্ষ ও একটি কৃষ্ণ পক্ষ কাটিয়া গিয়া আজ আবার শুক্লা একাদশী আসিয়াছে। এই রাত্রির কয়েকটি মিনিট লইয়া আমাদের গল্প; তবু দুঃখ এই যে জীবনের মিনিটগুলি বিচ্ছিন্ন নিরাসক্ত-ভাবে আসে না, তাহাদের পশ্চাতে অনাদিকালের উদ্যোগ সঞ্চিত হইয়া থাকে। 'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে, ধরণীর তলে, ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী—'

গান ও কবিতার সহিত প্রেমের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়াই আমরা জানি। কিন্তু আশ্চর্য, বিনয় এতদিন তাহার এই গোপন বন্ধুত্বটির গোপনতার রসই সমস্ত দেহ মন দিয়া উপভোগ করিয়াছে; ইহার গভীতর সম্ভাবনার ছায়া তাহার মনকে স্পর্শ করে নাই। অন্যপক্ষ হইতেও একটি সহজ সহৃদয়তা ছাড়া আর কিছুর ইঙ্গিত আসে নাই। দু'জনেই গান ভালোবাসে, গান লইয়া আলোচনাই বেশি হইয়াছে। সমাজ, সংস্কার, নীতি, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি অবান্তর কথাও মাঝে মাঝে উঠিয়াছে; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। মোট কথা, এই দুইটি তরুণ তরুণীর মধ্যে প্রণয়ঘটিত কোনও কথাই হয় নাই। হয়তো কেহ বিশ্বাস করিতেছেন না; কি করিব, আমি নিরুপায়।

কিন্তু এইবার বিশ্বাস করা বোধ হয় কঠিন হইবে না, কারণ—'আজি শুক্লা একাদশী—'

খাদ্যের সহিত প্রেমের কি কোনও সম্বন্ধ আছে? চিংড়ি মাছের কাট্‌লেট্ কি অন্তরে প্রণয় পিপাসা জাগাইয়া তোলে? নিষিদ্ধ অণ্ড কি উদরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের আদিমতম সত্যের ইশারা করিতে থাকে? পাঁঠার মাংস কি অজ, নিত্য এবং শাশ্বত জীবধর্ম উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে?

কে জানে? কিন্তু বিনয় আজ উক্ত তিনটি খাদ্যই প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিয়াছিল; এবং এই জন্যই বোধ করি তাহার বাঁশির গদ্‌গদ কুজনের সহিত সে মনে মনে বলিতেছিল—

আজি শুক্লা একাদশী—বিনতাকে আমি ভালোবাসি - -
হের তন্দ্রাহারা শশী—তার অধর-ছোঁয়া এই বাঁশি -
মখমলের মতো কালো নরম তার চোখ দুটি—
সিঁথির সরু রেখায় নেই সিঁদুরের চিহ্ন—
ভালোবাসি—ভালোবাসি—ভালোবাসি।

চিংড়ি মাছ, ডিম্ব ও পাঁঠার আশ্চর্য ক্ষমতা। বিনয় তন্দ্রাতুর চোখে পাশের বাড়ির ছাদের দিকে তাকাইয়া বাঁশি বাজাইতেছে - তাহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। বাঁশির সুর বদলাইয়া গেল—

সেহ কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু-চন্দা;
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
লাখ পবন বহু মন্দা।

পাশের ছাদ হইতে হাসির শব্দ আসিল, 'তাল কেটে যাচ্ছে যে!'

বাঁশি ফেলিয়া বিনয় আলিসার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

'বিনতা -!' উদ্গত কথাটা হঠাৎ আটকাইয়া গেল।

'কি?'

বিনয় সামলাইয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল, 'বিনতা, আজ শুক্লা একাদশী।'

'হ্যাঁ।' একটু হাসিয়া বিনতা চাঁদের দিকে মুখ তুলিল।

তাহার উন্নমিত মুখের পানে চাহিয়া বিনয়ের কণ্ঠাগত কথাটি বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। বিনতার মুখখানি শুষ্ক, চাঁদের পরিপূর্ণ আলো পড়িয়া যেন অত্যন্ত ফ্যাকাশে দেখাইল।

'বিনতা, তোমার মুখ এত শুকনো কেন? যেন সমস্ত দিন খাওনি।'

বিনতা আবার একটু হাসিল, 'সত্যিই আজ সমস্ত দিন খাইনি। আজ যে একাদশী।'

শ্রেষ্ঠ বিসর্জন

সাপ্তাহিক 'উল্কা'র সম্পাদক সুদর্শন রায় টেবিলে বসিয়া অধীর ভাবে একটা পেন্সিলের পশ্চাদ্ভাগ চুষিতেছিলেন।

সন্ধ্যা প্রায় সাতটা; কাল সকালেই কাগজ বাহির করিতে হইবে। অথচ তাঁহার টেক্কা মার্কা রিপোর্টার অজেন্দ্র পালের এখনও দেখা নাই। সেই যে সে বেলা একটার সময় বালিগঞ্জের ন্যুডিস্ট্ কলোনিতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছে—এখনও ফিরিল না!

এদিকে একটা ভারি গোপনীয় অথচ ইণ্টারেস্টিং খবর সম্পাদকের কানে আসিয়াছে, সেটা সম্বন্ধে কালকের কাগজে কিছু থাকাই চাই। গোপনীয় খবর ইণ্টারেস্টিং করিয়া বাহির করিবার জন্যই 'উল্কা'র কাটতি; 'উল্কা'র পাঠকেরা ইহা ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করে না। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া খবরের বাজার এত মন্দা যাইতেছে যে একটা হৃদয়গ্রাহী কেচ্ছাও 'উল্কা'য় বাহির হয় নাই। এবারে গরম গরম একটা কিছু না থাকিলেই নয়—'উল্কা'র বদনাম রটিয়া যাইবে। বিশেষতঃ, আজিকার এই খবরটা যদি অন্য কোনও সম্পাদক সংগ্রহ

করিয়া রাতারাতি ছাপিয়া বাহির করিয়া দেয়, তবে তো 'উল্কা'র প্রেষ্টিজ্ চিরদিনের জন্য ডুবিয়া যাইবে।

প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পাদকের কথা স্মরণ হইতেই সুদর্শন রায় পেন্সিলটা কড়মড় করিয়া চিবাইয়া ফেলিলেন।

কিন্তু তবু অজেন্দ্র পালের দেখা নাই।

অবশ্য 'উল্কা'র আরও রিপোর্টার আছে; কিন্তু অজেন্দ্র পাল তাহাদের মধ্যে সেরা। দুর্দমনীয় তারুণ্যের বলে সে সর্বত্র অপ্রতিহতগতি। সে ছাড়া আজিকার এই গোপনীয় খবরের তত্ত্বোদ্ঘাটন আর কেহ করিতে পারিবে না।

সম্পাদক ভাবিতে লাগিলেন, 'ছোঁড়া গেল কোথায়? · কোন তরুণীর খপ্পরে পড়ে নি তো?·· কিংবা···শেষে ন্যুডিস্ট্‌দের দলে ভিড়ে পড়ল নাকি! · '

দুশ্চিন্তায় সম্পাদক মহাশয় পেন্সিলটাকে একেবারে দাঁতন-কাঠি করিয়া ফেলিলেন।

ক্রমে ঘড়ির কাঁটা একপাক ঘুরিয়া গেল; প্রেসম্যান্ করুণভাবে দ্বারের কাছে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। সম্পাদক পেন্সিলটা শেষ করিয়া ফেলিলেন। তারপর রাত্রি সাড়ে আটটার সময় অজেন্দ্র পাল ফিরিয়া আসিল।

তাহার চেহারা স্মার্ট্; জুল্‌পি ও ঈষৎ গোঁফ আছে। পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া বলিল, 'এই নিন্—পাঠিয়ে দিন প্রেসে।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সম্পাদক বলিলেন, 'কি করছিলে এতক্ষণ?'

অজেন্দ্র পাল বলিল, 'ন্যুডিস্ট্ কলোনিতেই ছিলুম। সেখানে পুকুর পাড়ে উপু হয়ে বসে প্রোফেসার হরেকৃষ্ণ চট্টরাজ আর কুমারী সুনীতি মুখার্জি বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করছিলেন, তাই নোট করে

নিচ্ছিলুম। তাঁদের দু'খানা স্ন্যাপশট্‌ও তুলেছি—একখানা সামনে থেকে, একখানা পেছন থেকে।'

অজেন্দ্র ক্যামেরা ও ফিল্ম্‌-স্পুল টেবিলের উপর রাখিল। সম্পাদক প্রীত হইয়া বলিলেন, 'বেশ। তোমাকে এখনি আর একটা কাজে বেরুতে হবে।'

অজেন্দ্র উপবেশন করিল, গোঁফের উপর অঙ্গুলি বুলাইয়া কহিল, 'Shoot!'

সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি অনীতা সোমকে চেন?'

অজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিল, 'অবশ্য চিনি। বিখ্যাত তরুণী লেখিকা, 'আলিঙ্গন' নামক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা করেছেন।'

সম্পাদক বলিলেন, 'হ্যাঁ তিনিই। আমি খবর পেয়েছি, তিনি আজ রাত্রে আত্মহত্যা করবেন। গোপনীয় খবর। রাত্রি দ্বিপ্রহরে সাহিত্য-পরিষদের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন। এ বিষয়ে পুরো রিপোর্ট চাই—তোমাকে যেতে হবে।'

অজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, 'এই তরুণ বয়সে তিনি কেন প্রাণ বিসর্জন দিতে চান?'

'আজ পর্যন্ত কেউ বঙ্গসাহিত্যের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেন নি—তাই তিনি পথ দেখাচ্ছেন।'

'ও—বেশ।' অজেন্দ্র উঠিল, ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'চল্লুম আমি। রাত্রি একটার মধ্যেই রিপোর্ট পাবেন।'

অজেন্দ্র প্রস্থান করিল। সম্পাদক ন্যুডিস্ট্‌ কলোনির রিপোর্ট প্রেসে পাঠাইয়া দিয়া, ফোটো ডেভেল্‌প করিতে দিলেন। তারপর নিকটবর্তী হোটেলে আহারাদি করিতে গেলেন। আজ আর বাড়ি গেলে চলিবে না।

পান ভোজন শেষ করিয়া ফিরিতে সাড়ে দশটা বাজিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন ফোটো তৈয়ার হইয়া আসিয়াছে। সম্পাদক দীর্ঘকাল ধরিয়া ফোটো দুটি নিরীক্ষণ করিলেন; তারপর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া মনে মনে বলিলেন, 'নাঃ, এ ছবি ছাপা চলবে না। দেশে যে রকম্ সাধু-সন্ন্যাসীর উৎপাত, ছাপলেই ধরে জেলে পুরে দেবে।'

অতঃপর সম্পাদক অজেন্দ্র পালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বারোটা বাজিল, তারপর একটা; কিন্তু তথাপি অজেন্দ্রের দেখা নাই। সম্পাদক রাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। 'আরে বাপু, একটা ছুঁড়ি ছাত থেকে লাফিয়ে মরবে, তার জন্যে এত দেরি কিসের? এক মিনিটের তো কাজ!'

কিন্তু যদি না মরিয়া থাকে? হয়তো শুধুই ঠ্যাং ভাঙিয়াছে—সাহিত্য পরিষদ আর কত উঁচু। সম্পাদকের রাগ আরও চড়িয়া গেল—মনুমেণ্ট হইতে লাফাইলে কি দোষ ছিল? যদি আত্মহত্যাই করিতে চাস্, তবে একটু উঁচু জায়গা হইতে লাফা না কেন? যত সব—

যখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল তখন সম্পাদক উঠিয়া দুইবার সবেগে মেজের উপর পদদাপ করিলেন, তার পর ক্লান্তভাবে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বলিলেন, 'কোন্ শালা আর—'

সকালে অজেন্দ্র পাল আসিয়া দেখিল, সম্পাদক টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন।

অজেন্দ্র গলা খাঁকারি দিল।

আরক্তনেত্রে মাথা তুলিয়া সম্পাদক বলিলেন, 'কোন্ শালা⋯এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

অজেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল, 'এই নিন্ রিপোর্ট।'

সম্পাদক বলিলেন, 'সে ছুঁড়ি মরেছে তাহ'লে? মানে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে?'

অজেন্দ্র বলিল, 'তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন নি।'

'অ্যাঁ!—তবে তুমি কি কচু রিপোর্ট এনেছ?'

অজেন্দ্র গম্ভীর মুখে বলিল, 'তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন নি বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় জিনিস বিসর্জন দিয়েছেন।'

সম্পাদক চটিয়া বলিলেন, 'মানে—কি কচু বিসর্জন দিয়েছেন?'

অজেন্দ্র গোঁফের প্রান্তে একটু তা দিয়া সগর্বে বলিল, 'সতীত্ব।'

সন্দেহজনক ব্যাপার

মন্মথ নামক যুবককে প্রেমিক বলিব কিংবা কুচক্রী হত্যাকারী বলিব, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। সে পুঁটু ওরফে তমাললতা দেবীর প্রেমে পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; উপরন্তু পুঁটুর পিতামহ রামদয়ালবাবু যে মন্মথর হাতে পড়িয়াই প্রাণ হারাইয়াছিলেন তাহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। মোটিভ্ অর্থাৎ দুরভিসন্ধি যে তাহার পুরামাত্রায় ছিল তাহাও এখন প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। পুঁটুর সহিত সে বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় পাঠক যদি পুলিসে খবর দেন তাহা হইলে অন্ততঃ আমার দিক হইতে কোনও আপত্তি হইবে না।

মন্মথ যে আদর্শ বাঙালী যুবক নয় তাহার প্রমাণ,—সে কুড়ি বছর বয়স হইতে শেয়ার মার্কেটে বেচা কেনা করিয়া টাকা উপার্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এবং পঁচিশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই স্বাবলম্বী,

ফন্দিবাজ ও মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল; আমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার অসাধ্য কাজ নাই। সুতরাং মধ্যমনারায়ণঘটিত ব্যাপারটা তাহার স্বেচ্ছাকৃত কি না তাহা লইয়া কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আসামী পক্ষের উকিল হয়তো প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে যে মন্মথ ভ্রমক্রমে এই কার্য করিয়াছিল, কিন্তু আসামীর উকিলের কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা আমরা সকলেই জানি।

যা হোক্, এখন মামলার হাল বয়ান করা দরকার।

রামদয়ালবাবুর বয়স হইয়াছিল পঁয়ষট্টি বৎসর এবং তাঁহার টাকা ছিল পঁয়ষট্টি লাখ। কথাটা অবিশ্বাস্য—তবু সত্য। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, পুঁটু ব্যতীত আর সকল আত্মীয়-স্বজন পুত্র-পৌত্র মরিয়া গিয়াছিল। এই সকল পুত্র-পৌত্র যে তাঁহার সহিত বেইমানি করিবার উদ্দেশ্যেই মরিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া রামদয়াল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং উহাদের মজা দেখাইবার জন্যই প্রাণপণে শেয়ার মার্কেটে টাকা উড়াইতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। টাকা কিন্তু উড়িল না; ফলে গত পনের বছরের মধ্যে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা তাঁহার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত হইয়াছিল।

কিন্তু বাঙালী হইয়া এত টাকা রোজগার করিলে ভগবান তাহা সহ্য করিতে পারেন না; রামদয়ালকে আপাদমস্তক রোগে ধরিয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহার পায়ে ধরিয়াছিল বাত, এবং মস্তকে রক্তের চাপ বাড়িয়া মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তা ছাড়া চোখেও ছানি পড়িয়াছিল, ভালো দেখিতে পাইতেন না।

রামদয়াল সাবেক লোক, কবিরাজী চিকিৎসা করাইতেছিলেন। মস্তকের রক্ত-চাপ কমাইবার জন্য সুশীতল মধ্যমনারায়ণ তৈল সর্বদা মস্তকে

মাখিতেন। পদদ্বয়ের বাত-বেদনা অপনোদনের জন্য মহাতেজস্কর মহামাস তৈল বিমর্দিত করাইতেন, এবং দুই চক্ষুতে ভেষজগুণাক্রান্ত কোনও বৃক্ষের রস দিয়া চক্ষু বন্ধনপূর্বক ধৃতরাষ্ট্র সাজিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে গন্ধগোকুলের ন্যায় সুরভি নির্গত হইতে থাকিত।

একদা প্রাতঃকালে রামদয়াল নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া শট্‌কা টানিতেছিলেন; এমন সময় মন্মথ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। অধিক বাক্য-ব্যয় না করিয়া সে কাজের কথা পাড়িল। ধৃতরাষ্ট্ররূপী রামদয়ালকে বলিল, 'শুনেছি আপনার কাছে এক হাজার 'গিরি-গোবর্ধন' শেয়ার আছে। বেচে ফেলুন, আমি এক টাকা প্রিমিয়াম্ দিয়ে কিনে নিতে রাজি আছি।'

রামদয়াল বলিলেন, 'তুমি কে হে বাপু?'

'আমার নাম মন্মথ মজুমদার। যদি সৎপরামর্শ চান, এই বেলা গিরি-গোবর্ধন বেচে ফেলুন; নইলে আপনারই বুকে চেপে বসবে।'

রামদয়াল হাঁকিলেন, 'পরশুরাম!'

ভিতর দিকের পর্দা সরাইয়া একটি তরুণীর মুখ দেখা গেল; পুঁটু বলিল, 'কি বলছ দাদু? পরশুরাম কবিরাজের বাড়ি গেছে।'

রামদয়াল বলিলেন, 'বেশ, তুমিই এসো। এই বেয়াদব লোকটাকে কান ধরে বার করে দাও।'

পুঁটু ঘরে প্রবেশ করিল; মন্মথ ও পুঁটুর দৃষ্টিবিনিময় হইল। মন্মথ একটু হাসিল, পুঁটু একটু লাল হইল।

মন্মথ খাটো গলায় পুঁটুকে বলিল, 'এই যে কান—ধরুণ।'

পুঁটু লজ্জা পাইয়া চুপি চুপি বলিল, 'দাদু রেগেছেন। এখনই ব্লাড্‌প্রেসার্ বেড়ে যাবে। আপনি যান।'

রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কান ধরেছ?'

পুঁটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'ধরেছি।'

রামদয়াল বলিলেন, 'বেশ, এবার বার করে দাও। ফের যদি এ বাড়িতে মাথা গলায়, জুতো-পেটা করব।'

পুঁটু ও মন্মথ পাশাপাশি বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল। মন্মথর মুখ কৌতুকে চটুল, পুঁটুর গাল দুইটি লজ্জায় অরুণাভ।

বাহিরে আসিয়া মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার নাম কি?'

পুঁটু বলিল, 'পুঁ—মানে তমাললতা।'

মন্মথ বলিল, 'আজ বিকেলবেলা আমি আস্‌ব। 'গিরি-গোবর্ধন' বিক্রি করে ফেলা যে একান্ত দরকার, এ কথা আপনাকে বুঝিয়ে দেব।'

অতঃপর পাদুকা-প্রহারের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া মন্মথ প্রত্যহ সকাল বিকাল রামদয়ালের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই ভাবে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল। রামদয়াল চক্ষে ফেট্টা বাঁধিয়া মস্তকে ঠাণ্ডা তৈল ও পদদ্বয়ে গরম তৈল মালিশ করাইতে লাগিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবনে ও পুঁটুর অন্তর্লোকে যে গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা জানিতেও পারিলেন না।

একদিন মন্মথ পুঁটুকে, বলিল, 'পুঁটু, গিরি-গোবর্ধন শেয়ার আমার চাই; কারণ, তোমাকে বিয়ে করা আমার একান্ত প্রয়োজন।'

পুঁটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইল, তারপর বলিল, 'দাদু তোমার নাম শুনলে জ্বলে যান।'

মন্মথ বলিল, 'এর একটা বিহিত করা দরকার। তোমাকে বিয়ে করা এবং গিরি-গোবর্ধন শেয়ার হস্তগত করা আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

পুঁটু বলিল, 'হনুমানপুরের রাজবাড়িতে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

মন্মথ বলিল, 'হনুমানপুরকে কলা দেখাব। এসো, দুজনে ষড়যন্ত্র করি।

তখন উভয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

পরশুরাম নামক ভৃত্য রামদয়ালবাবুর মস্তকে ও পদদ্বয়ে তৈল মালিশ করিত। সে হঠাৎ একমাসের ছুটি লইয়া রুগ্না স্ত্রীকে দেখিতে দেশে চলিয়া গেল। তাহার স্থানে যে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া গেল, তাহার নাম নসীরাম। নসীরামের অপর নাম মন্মথ।

নসীরাম অত্যন্ত মনোযোগসহকারে রামদয়ালকে তৈল মর্দন করিতে লাগিল। রামদয়াল সর্বদা চোখে ফেট্টা বাঁধিয়া থাকিতেন না ; মাঝে মাঝে খুলিতেন। নসীরামের চেহারা দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল। ছোকরা লেখাপড়াও কিছু কিছু জানে ; তাহাকে দিয়া শেয়ার মার্কেটের রিপোর্ট পড়াইয়া শুনিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নসীরাম আসিয়া অবধি গিরি-গোবর্ধন শেয়ারের দাম দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে। মন্মথ মজুমদার নামক বেয়াদব ছোকরার কান ধরিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য তিনি অনুতাপ বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি একগুঁয়ে লোক, শেয়ার বিক্রির কথা মুখে উচ্চারণ করিলেন না।

ওদিকে হনুমানপুরের রাজবাড়িতে পুঁটুর বিবাহের কথা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ চিঠিপত্রের আদানপ্রদান একেবারে থামিয়া গেল। ইহার কারণ, রামদয়াল নসীরামকে চিঠি ডাকে ফেলিবার জন্য দিতেন, নসীরাম তৎক্ষণাৎ তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিত, এবং হনুমানপুর হইতে যে সব পত্র আসিত পুঁটু তাহা নির্বিকারচিত্তে আত্মসাৎ করিত।

কিন্তু তবু হনুমানপুরকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না। পঁয়ষট্টি লাখ টাকা রাজরাজড়ার পক্ষেও সামান্য নয়, বিশেষতঃ যদি রাজার সমস্ত রাজস্ব মহাজনের কাছে বন্ধক থাকে।

একদিন হনুমানপুরের এক দূত উপস্থিত হইল। সে জানাইল যে, রামদয়ালের পত্রাদি না পাইয়া মর্মাহত রাজা স্বয়ং কলিকাতায় আসিতেছেন; কল্যই কথাবার্তা পাকা করিয়া ফেলিতে চান। পত্রাদির ব্যাপার শুনিয়া রামদয়াল নসীরামের উপর অতিশয় সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

সেইদিনই দ্বিপ্রহরে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেল।

পুঁটু রামদয়ালের বুকের উপর কাঁদিয়া পড়িয়া বলিল, 'দাদু, আমি – আমি হনুমানপুরে বিয়ে করব না।'

রামদয়াল বলিলেন, 'কী !'

পুঁটু ফুঁপাইকে ফুঁপাইতে বলিল, 'আমি নসীরামকে বিয়ে করব।'

শুনিবামাত্র রামদয়ালের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। তিনি একটি হুংকার ছাড়িয়া ডাকিলেন, 'নসীবাম !'

নসীরাম নিকটেই ছিল, বলিল, 'আজ্ঞে, আমার নাম মন্মথ।'

রামদয়াল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

নসীরাম ছুটিয়া গিয়া শিশি হইতে রামদয়ালের মাথায় তৈল ঢালিতে আরম্ভ করিল। পুঁটু কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে অন্য শিশির তৈল মালিশ করিতে লাগিল।

কবিরাজ আসিয়া দেখিলেন, অবস্থা সাংঘাতিক। ঔষধ উল্‌টা-পালটা হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ পায়ে মধ্যমনারায়ণ ও মাথায় মহামাস মালিশ চলিতেছে।

এই সাংঘাতিক চিকিৎসা-বিভ্রাটের ফলে রামদয়াল সেই রাত্রেই পরলোক যাত্রা করিলেন।

* * *

পরদিন হনুমানপুর উপস্থিত হইলে নসীরাম সবিনয়ে তাঁহাকে বলিল,

'আপনি আসবেন শুনে রামদয়ালবাবু মারা গেছেন। এখন আপনি রাজত্বে ফিরে যেতে পারেন।'

শ্রাদ্ধ শেষ হইলে মন্মথ পুঁটুকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'পুঁটু দুঃখ ক'রোনা, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো আমাদের দুজনকেই খুন করতেন; কিংবা আমাকে খুন করে তোমাকে হনুমানপুরের সঙ্গে বিয়ে দিতেন। সেটা কি ভালো হ'ত? এদিকে দেখছ তো, গিরি-গোবর্ধনের শেয়ার চড়বড় করে উঠছে। এখন অশৌচটা কেটে গেলেই...'

মন্মথকে পুলিসে দেওয়া যাইতে পারে কিনা আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। আর কিছু নয়, সে গিরি-গোবর্ধনের নাম করিয়া পঁয়ষট্টি লাখ টাকা মারিয়া দিবে ইহাই অসহ্য বোধ হইতেছে।

স্বর্গের বিচার

আমি স্বর্গে গিয়াছিলাম।

বন্ধুগণ শুনিয়া হয়তো অবিশ্বাসের অট্টহাস্য করিতেছেন; ভাবিতেছেন, তাঁহাদের ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নন, তাঁহাদের এ কথা বিশ্বাস করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। আমি যে ধার্মিক এবং সত্যনিষ্ঠ লোক, এ কথা সাধারণ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমটা ভাবিয়াছিলাম, আমার নানাবিধ পুণ্যকার্যের সংবাদ পাইয়া বুঝি দেবরাজ স্থায়ীভাবে আমার স্বর্গে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন;

কিন্তু দেখিলাম, তাহা নয়, সাক্ষী দিবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। বিচার-সভায় হাজিরা দিতে হইবে।

মেঘলোক ভেদ করিয়া বৈদ্যুতিক পুষ্পকরথ স্বর্গের এলাকায় পৌঁছিলে অমরাবতীর বিস্তৃত দৃশ্যটা এক নজরে দেখিয়া লইলাম। এদিকে মন্দাকিনীর ঘাটে বস্ত্রাদি খুলিয়া রাখিয়া কয়েকটি অপ্সরা জল-কেলি করিতেছে, কয়েকজন রসিক দেবতা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। ওদিকে চন্দ্রদেব নন্দন-কাননে পারিজাত-বৃক্ষের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া গত রাত্রির খোঁয়াড়ি ভাঙিতেছেন, পাশে সুধা-ভৃঙ্গার পড়িয়া আছে। দুই জন তকমা-পরা দেবদূত তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছে, কিন্তু তিনি নড়িতেছেন না, কেশহীন সুচিক্কণ মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে কেবলই ফিক্‌ফিক্ হাসিতেছেন।

এই সব মনোরম দৃশ্য অতিক্রম করিয়া পুষ্পকরথ বিচারগৃহের সিংহ-দ্বারে উপনীত হইল। একটি স্বর্গীয় বটবৃক্ষতলে বহু আসামী-ফরিয়াদী-সাক্ষী-পেয়াদা জমা হইয়াছে। একটা ষণ্ডা গোছের যমদূত আমাকে খপ করিয়া ধরিয়া বিচারমণ্ডপে হাজির করিল এবং মুহূর্ত মধ্যে হলফ পড়াইয়া কাঠগড়ায় তুলিয়া দিয়া আবার অন্তর্হিত হইল।

দেখিলাম, সম্মুখেই উচ্চ আসনে দণ্ডধারী যমরাজ বসিয়া আছেন; তাঁহার নিম্নে পেশকার চিত্রগুপ্ত এক রাশ নথিপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

তারপর অদূরে অপর একটি কাঠগড়ায় আসামীর উপর নজর পড়িল। আরে, এ যে হতভাগা ক্যাবলা! তিন দিন আগে তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

ক্যাবলাকে আমি বাল্যাবধি চিনি, তাহার জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই আমার অজানা নাই। সে যে কত বড় নরাধম, তাহা বোধ হয় যমরাজ

স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাই আমাকে তলব হইয়াছে। ক্যাবলা রৌরব নরকে যাইবার যোগ্য, অথবা কেবলমাত্র কুম্ভীপাক পর্যন্ত গিয়াই নিষ্কৃতি পাইতে পারে, ইহাই সম্ভবতঃ বিচার্য বিষয়।

যমরাজ প্রচণ্ড স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ক্যাবলাকে চেন?'

করজোড়ে কহিলাম, 'চিনি ধর্মাবতার।'

হংসপুচ্ছ তুলিয়া লইয়া যমরাজ বলিলেন, 'ভালো, তার জীবন-কাহিনী বর্ণনা করো।'

বলিলাম, 'কি আর বর্ণনা করব হুজুর, ছোঁড়া ছেলেবেলা থেকেই অধঃপাতে গিয়েছিল। তেরো বছর বয়সে তাড়ি খেতে শেখে···'

'তারপর?'—ধর্মরাজ জবানবন্দী লিখিয়া লইতে লাগিলেন।

'ইস্কুলে ক্যাবলার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তুম হুজুর। ক্যাবলার মতো পাজি বজ্জাত ছেলে ইস্কুলে আর একটিও ছিল না। লেখাপড়া এক দম করত না, স্রেফ শয়তানি করে বেড়াত। গাঁয়ের জমিদারবাবুর ওপর তার ভীষণ আক্রোশ ছিল। তাঁর পোষা হাঁসের ডিম চুরি করে এনে পুকুর পাড়ে সেদ্ধ করে খেত; তাঁর পুকুর থেকে মাছ চুরি করে ভিন গাঁয়ে বিক্রি করে আসত। আমরা মানা করলে বলত, 'জমিদার তো চোর, তার ওপর বাটপাড়ি করলে দোষ নেই।' একদিন জমিদারের তালগাছ থেকে ভাঁড় নামিয়ে একাই ভাঁড় সাবাড় করে দিলে। তার পর টলতে টলতে ইস্কুলে এসে হাজির হ'ল। ক্লাসে পণ্ডিত মশাই তখন একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন, ক্যাবলা ঘরে ঢুকেই বেবাক তাঁর মাথায় বমি করে দিলে।'

দেখিলাম, যমরাজের ভয়ংকর গোঁফজোড়া হঠাৎ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রূ-যুগল কপালের উপর নাগ-নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে। যমরাজ ক্যাবলার উপর কুপিত হইয়াছেন, অথবা হাসি চাপিবার চেষ্টা

করিতেছেন, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তিনি মুখখানাকে বিকট রকম কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'তারপর ? সংক্ষেপে বলো।'

'সংক্ষেপেই বলছি ধর্মবতার। ক্যাবলাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আমরা গাঁয়ের ভালো ছেলেবা তার সঙ্গে কথা কওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিলুম; সে দুলে-ক্যাওরার ছেলেদের সঙ্গে দিনরাত বদ্মায়েসি করে বেড়াতে লাগল।

'যতই তার বয়েস বাড়তে লাগল, ততই সে বিগড়ে যেতে লাগল। তার চরিত্র একদম খারাপ হয়ে গেল হুজুব। দুলে-পাড়ার একটি বিধবা স্ত্রীলোককে জমিদারবাবু অনুগ্রহ করতেন, ক্যাবলার নজর পড়ল তার ওপর। জমিদারবাবুর ওপর ক্যাবলার বরাবরই রাগ, সে একদিন দুলে মেয়েটাকে নিয়ে লোপাট হয়ে গেল।

'ছ'মাস পরে ক্যাবলা ফিবে এলো। শোনা গেল, মেয়েটা নাকি ক্রিশ্চান হয়ে গেছে। ক্যাবলা যেন ভারী সৎকাজ করেছে, এমনই ভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লাগল।'

এইবার ক্যাবলা হঠাৎ কথা কহিল, বলিল, 'হুজুর, ক্ষেন্তিকে আমি নিজের বোনের মতো ভালবাসতুম। জমিদার শালা তাকে···'

'চোপ রও!'—ধর্মরাজ কটমট করিয়া তাকাইলেন, তারপর আমাকে বলিলেন, 'বলে যাও!'

আমি বলিতে লাগিলাম, 'ক্যাবলার এক খুড়ো ছিলেন, তিনি তাকে ঘরবাসী করবার জন্যে তার বিয়ে দিলেন। বউটির বয়স বছর এগারো, কিন্তু পেটে প্রকাণ্ড পিলে হুজুর। এই পিলে-সুদ্ধু মেয়েটাকে নিয়ে ক্যাবলা একেবারে মেতে উঠল। সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু এই সময়টাতে ক্যাবলা নাকি তাড়ি গাঁজাও ছেড়ে দিয়েছিল।

'বছর খানেক এই ভাবে কাটবার পর ক্যাবলা একদিন বউকে

খুড়োর কাছে রেখে বিদেশ গেল। শুনলুম, টাকা রোজগার করতে কলকাতায় গেছে।

'তারপর তিন বছর আর তার দেখা নেই। কলকাতায় সে কি করছিল, তা আপনারাই ভালো জানেন, ধর্মাবতার। শুনতুম সে ক্ষেন্তির বাড়িতে থেকে থিয়েটার করত। বাড়িতে একটি পয়সা পাঠাত না; ন-মাসে ছ-মাসে একটা চিঠি দিত—এই পর্যন্ত।

'ক্যাবলার পৈত্রিক দু-এক বিঘে জমি ছিল, তাও খাজনার দায়ে নিলেম হয়ে গেল। ঘরের সম্পত্তি পরের হাতে যাবে, তাই খুড়োমশায় সেটা কিনে নিলেন! কিন্তু ক্যাবলার বউকে খাওয়ায় কে? খুড়ো হাজার হোক্ জ্ঞাতি, ভাইপো-বউকে তো চিরকাল পুষতে পারেন না? যত দিন ক্যাবলার জমি ছিল, ততদিন তাকে খোরপোষ দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন?

'আমরা গাঁয়ের পাঁচজন হয়তো ক্যাবলার বউকে দু-মুঠো খেতে দিতে পারতুম। কিন্তু পরের সোমত্ত বউকে খেতে দিয়ে কে নিন্দে কুড়ুবে হুজুর? সকলকেই তো স্ত্রী-পরিবার নিয়ে ঘর করতে হয়!

'ক্যাবলার বউয়ের যখন ভীষণ দুরবস্থা, তখন জমিদারবাবু কৃপা করলেন। শিবতুল্য লোক যদি কেউ থাকে তো সে আমাদের জমিদারবাবু। এক কথায় ক্যাবলার বউয়ের সমস্ত ভার তিনি নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন। বেশি কি বলব হুজুর, তিনি তাকে গয়না পর্যন্ত গড়িয়ে দিলেন। দিনের বেলা পাছে কেউ কিছু মনে করে, তাই রাত্তিরে লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতেন। খুড়োমশায় অবশ্য সবই জানতেন, কিন্তু তিনি ধর্মভীরু লোক—কাউকে একটি কথা বলেন নি।

'এইভাবে চলতে লাগল। পাড়াগাঁয়ে কোনও কথাই চাপা থাকে না, কিন্তু তাই বলে পরের হাঁড়িতে কাঠি দিতেও কেউ ভালোবাসে না।

বিশেষতঃ, জমিদারবাবু মানী লোক; তাই সব দিক বিবেচনা করে আমরা চুপচাপ রইলুম।

'তারপর হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে ক্যাবলা ফিরে এলো। কোথা থেকে খবর পেয়েছিল জানি না; গাঁয়েরই কোনও লোক বোধ হয় বেনামী চিঠি দিয়ে তাকে জানিয়েছিল।'

ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে জানিয়েছিল?'

'তা তো মনে পড়ছে না, হুজুর।'

'চিত্রগুপ্ত, খাতা দেখ।'

খাতা দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিল, 'ইনিই বেনামী চিঠি দিয়েছিলেন। এই যে হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট রয়েছে।'

আমি বলিলাম, 'তা—বোধ হয়—হ্যাঁ, আমিই দিয়েছিলুম হুজুর, ভালোর জন্যেই…'

'হুঁ। তারপর বলো।'

'তারপর বলতে আমারই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, ধর্মাবতার। ক্যাবলা ঘরে ঢুকে একবার আপাদমস্তক তার বৌয়ের পানে তাকালে, তারপর জমিদারের দেওয়া সোনার চন্দ্রহার তার কোমর থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বউকে একটি কথাও বললে না।

ঘুটঘুটে রাত্তির, হুজুর। ক্যাবলা সটান জমিদারবাবুর পাঁচিল ডিঙিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকল। তারপর যা হ'ল তা সবাই জানে। সকালবেলা দেখা গেল, জমিদারবাবু গলায় চন্দ্রহার জড়িয়ে মরে পড়ে আছেন। পৈশাচিক কাণ্ড, ধর্মাবতার। ক্যাবলা তাঁরই চন্দ্রহার তাঁর গলায় জড়িয়ে তাঁকে খুন করেছে।'

কিছুক্ষণ বিচারসভা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে ধর্মরাজ একবার সজোরে গলা খাঁকারি দিলেন।

'তোমার আর কিছু বলবার আছে ?'

'আর কি বলব হুজুর ? আদালতে ক্যাবলার বিচার হ'ল। আমরা সবাই সাক্ষী দিলুম। ক্যাবলা কিন্তু একানাগাড়ে মিথ্যে কথা বলে চলল। বললে, তার স্ত্রী একেবারে সতীসাধ্বী, জমিদার তার জমি নিলেম করিয়ে নিয়েছিল বলেই সে তাকে খুন করেছে। আমরা যতই বলি বউয়ের পেটে ছেলে এলো কোত্থেকে, সে ততই বলে ছেলে নয় পিলে। এতবড় পাষণ্ড ক্যাবলাটা, ফাঁসি-কাঠে ঝুলে পড়ল, তবু সত্যি কথা মানলে না।

'হুজুর, ক্যাবলার যদি ধর্মজ্ঞান থাকত তাহলে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করত, এমন তো কতই হচ্ছে। নরহত্যা করবার কি দরকার ছিল ? কিন্তু আগেই বলেছি, জমিদারবাবুর ওপর তার ছেলে-বেলা থেকে রাগ ছিল··'

ধর্মরাজ হঠাৎ গর্জন ছাড়িলেন, 'আসামী খালাস !'

আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম।

'প্রভু ! ধর্মাবতার ! একি বলছেন ? ক্যাবলা যদি মুক্তি পায়, সমাজ টিকবে কি করে ?'

ধর্মরাজ তাঁহার জ্বলন্ত চক্ষু আমার দিকে ফিরাইলেন। বাঘের মতো চাপা গর্জনে বলিলেন, 'আর তুমি—তুমি—'

ধর্মরাজের চক্ষু হইতে অসহ্য আলোর রক্ত শিখা বাহির হইয়া আমার চক্ষুকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ; মনে হইল, আগুনের দুইটা শূল আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে।

* * *

ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, সকালবেলার এক ঝলক রাঙা রৌদ্র জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া আমার চোখে পড়িয়াছে।

স্বাধীনতার রস

পনেরোই আগস্ট ভোর বেলা একটা চায়েব দোকানে বসিয়া চা পান কবিতেছিলাম। সারারাত্রি ছাপাখানার কাজ গিয়াছে, এই খানিকক্ষণ আগে খবরের কাগজ বাহির করিয়া দিয়া বাড়ি যাইতেছি, পথে এক পেয়ালা চা সেবন করিয়া লইতেছি।

রাত্রি বারোটায় যে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখনও নিঃশেষ হয় নাই, আকাশে বাতাসে তাহার রেশ লাগিয়া আছে। সারারাত্রি দারুণ উত্তেজনা গিয়াছে, তাই ক্লান্ত মস্তিষ্ক লইয়া ভাবিতেছিলাম, আজ যদি বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতেন! দেশবন্ধু বাঁচিয়া থাকিতেন! ববীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতেন!

'বল হরি হরি বোল্' শব্দে চট্‌কা ভাঙ্গিয়া দেখি বাস্তা দিয়া মড়া লইয়া যাইতেছে। আমাব পাশেব একটি টেবিলে দুইটি ছোকরা মুখোমুখি বসিয়া চা পান করিতেছিল, একজন দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ভদ্দরলোকের সইল না হে।'

বাহিবেব দিকে তাকাইয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম। আমাদের কেষ্ট গামছা কাঁধে মড়ার অনুগম করিতেছে। কেষ্ট ছাপাখানায় আমার অধীনে কাজ করে। কাল রাত দেড়টাব সময় বাপের অসুখ বাড়ার খবর পাইয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল। তবে কি কেষ্টর বাবাই গেলেন নাকি?

তাড়াতাড়ি চায়ের দোকানের পাওনা চুকাইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। একটু পা চালাইয়া কেষ্টকে ধরিয়া ফেলিলাম,—'কি হে কেষ্ট—?'

কেষ্টর বাবাই বটে। দীর্ঘকাল পঙ্গু থাকিয়া কাল শেষ রাত্রে মুক্তি-লাভ করিয়াছেন।

কেষ্ট ছেলেটা ভাল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান অভিমুখে চলিলাম। যাইতে যাইতে কেষ্টর মুখে তাহার বাবা নবগোপালবাবুর জীবন ও মৃত্যুর যে ইতিহাস শুনিলাম তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

আঠারো বৎসর পূর্বে নবগোপালবাবু এক বিলাতী সওদাগরী আপিসে বড়বাবু ছিলেন, সাংসারিক অবস্থা ভালই ছিল। তারপর তাঁহার রাহুর দশা পড়িল। একদিন আপিসের বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁহার কথা কাটা-কাটি হইল। সাহেব অত্যন্ত বদমেজাজী, উপরন্তু সেদিন দিনের বেলাই প্রচুর হুইস্কি টানিয়াছিল, সে নবগোপালবাবুকে লাথি মারিতে মারিতে বাহির করিয়া দিল।

নবগোপালবাবুর ব্লাড্‌প্রেসার ছিল। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। পক্ষাঘাতের প্রথম আঘাত। নবগোপাল-বাবু মরিলেন না বটে কিন্তু তাঁহার বাম অঙ্গ অসাড় হইয়া গেল। কিছু দিন বিছানায় কাটিল। তারপর ক্রমে তিনি লাঠিতে ভর দিয়া ঘরের মধ্যে অল্প সল্প ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিলেন বটে কিন্তু তার বেশী নয়।

ছেলেরা তখন নাবালক, প্রথম কয়েক বছর খুবই দুর্দশা গেল। তারপর কেষ্ট ও তাহার বড় ভাই চাকরি পাইল। কায়ক্লেশে সংসার চলিতে লাগিল।

নবগোপালবাবু একটি ঘরে থাকিতেন। এই ধরনের রোগীরা যেরূপ হাঙ্গামা করে তিনি সেসব কিছুই করিতেন না। খাইতে দিলে খাইতেন, পঙ্গু শরীর লইয়া নিজের কাজ যতদূর সম্ভব নিজেই করিতেন। কেবল তাঁহার একটি অভ্যাস ছিল, পাশের বাড়ি হইতে ধার করা খবরের কাগজটি প্রত্যহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পড়িতেন। কোনও দিন কাগজ না পাইলে তাঁহার ক্ষোভের সীমা থাকিত না।

কথা তিনি বড় একটা কাহারও সহিত বলিতেন না; কিন্তু মাঝে মাঝে রক্তের চাপ বাড়িলে একটু বকাবকি করিতেন। তাহাও ব্যক্তিগত নালিশ নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি খুব পাকা ছিল না, তাই মাথায় রক্ত চড়িলে বলিতেন, 'ভালমানুষের কাজ নয়, অহিংসাতে চিঁড়ে ভিজবে না - মেরে তাড়াতে হবে ওদের লাথি মেরে তাড়াতে হবে —'

ক্রমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল। নবগোপালবাবু কাগজ পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—'এইবার শালারা প্যাঁচে পড়েছে—মারো মারো—লাথি মেরে দূর করে দাও—'

মহাযুদ্ধের ঘোলাটে বন্যা অনেক সাম্রাজ্যের ভিত ঢিলা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হইল; যে ঐশ্বর্য, শিথিল হস্ত হইতে আপনি খসিয়া পড়িতেছে তাহাই দান করিয়া যশস্বী হইতে চাহিল।

নবগোপালবাবু কিন্তু ভয় পাইয়া গেলেন। ইংরেজ সত্যই স্বাধীনতা দিবে ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। হয় তো ভিতরে কোনও শয়তানি আছে। স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইতেছে ইহাও তাঁহার মনঃপুত নয়……

তারপর বহু বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া চৌদ্দই আগস্ট আসিল। নবগোপালবাবু তন্ন তন্ন করিয়া খবরের কাগজ পড়িলেন। না, স্বাধীনতাই বটে। কিন্তু —

রাত্রি বারোটার সময় চারিদিকে শাঁখ বাজিয়া উঠিল, মেয়েরা হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। রাস্তায় রাস্তায় লোক গমগম করিতেছে, বিদ্যুতের আলোয় চারিদিক দিনের মত হইয়া গিয়াছে।

নবগোপালবাবু নিজের ঘরে জাগিয়া শুইয়া ছিলেন। হঠাৎ তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ করিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন।

রাস্তায় দলে দলে লোক চলিয়াছে, চীৎকার করিতেছে— জয় হিন্দ! বন্দে মাতরম! গান গাহিতেছে—কদম কদম বাড়ায়ে যা—

নবগোপালবাবু লাঠিতে ভর দিয়া ফুটপাতে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার গাল বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বাড়ির ভিতর হইতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু নবগোপালবাবু কর্ণপাত করিলেন না।

হঠাৎ তিনি দেখিলেন, নাবিকের বেশ পরিহিত একটা গোরা রাস্তা দিয়া আসিতেছে। নবগোপালবাবুর মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। নাবিকটা পাশ দিয়া যাইবার সময় তিনি তাহাকে একটা লাথি মারিলেন।

লাথিতে বিশেষ জোর ছিল না, নবগোপালবাবু নিজেই পড়িয়া গেলেন। গোরা নাবিক লাথি খাইতে অভ্যস্ত নয়, সে ঘুষি বাগাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এই সময় রাস্তার কয়েকজন লোক দেখিতে পাইয়া হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল। নাবিক বেগগতিক বুঝিয়া হাতের ঘুষি সম্বরণ পূর্বক দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

নবগোপালবাবুকে ধরাধরি করিয়া বাড়ির ভিতর আনা হইল। কিন্তু তিনি তখন অজ্ঞান।

তাঁহার আর জ্ঞান হইল না; শেষ রাত্রির দিকে তিনি মারা গেলেন।······

চায়ের দোকানের ছোকরার আক্ষেপ মনে পড়িল,—'ভদ্দর লোকের সইল না হে!' নূতন স্বাধীনতার রস বড় উগ্র। নবগোপালবাবু সহ্য করিতে পারেন নাই। এখন আমাদের সহ্য হইলে হয়।

———